হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পথের আলো

চৈত্র * ১৪২০

অষ্টাচত্বারিংশ বর্ষ * দ্বাদশ সংখ্যা

বন্দে বন্দারুমন্দারং বৃন্দারকবিবন্দিতম্।
স্মেরাস্যং সুন্দরং সৌম্যং সীতারামং সনাতনম্॥
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংস-কুঞ্জর-কেশরী।
কালিন্দী-কলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী॥

উপদেষ্টা মণ্ডলী
সংঘাচার্য ডঃ নির্মল কুমার পাণিগ্রাহী
সংঘ-সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ
সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম-সম্পাদক
অধ্যাপক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য
কিঙ্কর সামানন্দ

সহ-সম্পাদক
শ্রী সমীরণ মুখোপাধ্যায়

সঞ্চালক, বার্তা বিভাগ
কিঙ্কর প্রণবানন্দ

সঞ্চালক, মুদ্রণ বিভাগ
শ্রী বিমলাক্ষ ভট্টাচার্য

সঞ্চালক, উপায়ন বিভাগ
শ্রী তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঞ্চালক, শ্রীকোষ বিভাগ
শ্রী দীপক দেবনাথ

কর্মাধ্যক্ষ
শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামিলন মঠ
৭/৭, পি.ডব্লিউ.ডি. রোড, কোলকাতা - ১০৮
দূরভাষ ঃ ২৫৭৭ ৫১৭৯/২৮৭৩ ২৪৩৮
website : www.patheralo.org

সূ চী প ত্র

দশ টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডী *
শ্রীশ্রীঠাকুর ৫১৯

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ *
কিঙ্করী যোগমায়া দেবী ৫২১

সব তুমি *
শ্রী অরূপ কর ৫২৩

কৃপার কণা *
শ্রীমতী দূর্গা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২৫

বিভাসতীর্থ *
শ্রী প্রদীপ দাস ৫২৮

যুগে যুগে মানুষের বর প্রার্থনার বৈচিত্র্য *
দেবপ্রসাদ মজুমদার ৫৩০

শ্রীনামপ্রচার...১২৩তম ওঙ্কারপঞ্চমী...মুম্বই *
নিবেদক ঃ কিঙ্কর দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী ৫৩৫

শ্রীশ্রীঠাকুরের ১২৩তম...মহামিলন মঠে ২০... *
নিবেদক ঃ শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩৯

পাঠকের পত্র * সঞ্জিত ভূঞ্যা ৫৪৩
সম্পাদকের উত্তর * ৫৪৬

প্রতি সংখ্যা ঃ দশ টাকা মাত্র *** বার্ষিক সডাক মূল্য ঃ একশো টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়...

আমাদের 'আছি' এই অনুভূতি কয়েক ধারায় সামনে আসে চেতনার পথে, কিম্বা বলা ভাল নিজের 'আমি' টাকে আমরা টের পাই পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত, তেমনি কখনও চোখ, কান, জিভ, নাক, ত্বকে। কখনও বা মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কারে। কাঁচা আর স্থূল শরীরের যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—সেটা আমারই, বা 'আমিই এটা'—এমন অসম্ভব প্রত্যয়কে আশ্রয় করেই দেখতে দেখতে জীবনটা কেটে যায়। আবার আমি ভাবছি, যাচ্ছি এটা-ওটা করছি এমনও মনে হওয়া জুড়ে থাকে মনের আশপাশেতলায়।

আমাদের এই 'আছি' অনুভবটাই যত দুঃখের মূল। কারণ আমি যদি আছি তাহলে 'আমার' বলেও অনেক কিছু রইল, যা 'আমি' নয়। যা 'এটা' হতে পারে 'ওটা' কিম্বা 'সেটা'ও হতে পারে কিন্তু কখনও 'আমি' হয়ে ধরা দেবে না আমার চেতনায়। অথচ জগৎ জুড়ে 'আমি' বই আর কিছু নেই এমনটাই শাস্ত্রে শোনা যায়। সেই 'আমি'র স্বভাব হল শরীরের গণ্ডি পার হলেই 'তুমি' হয়ে যাবে! সেই 'তুমি' যা আসলে সকল 'আমি'র বাসা। ধরা যাক্ আমি যদি রাম বলে নিজেকে বুঝি, তাহলে শ্যাম, যদু, মধু, গাছ, নদী, পাহাড়—এমনি বাকি সব কিছুই বুদ্ধিতে তখন নিজের নিরিখে 'ইদম্' বা 'এটা'। যা 'ইদম্' তা তখনও 'অহম্' বা আমি হতে পারে না, বড় জোর 'আমার' হয়ে কাছে এসে ধরা দিতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে দুঃখ আসবেই-প্রজ্ঞাবান্ তো তেমনটাই বলেন। জীবনে কি তাহলে 'সুখ!' অধরাই থেকে যায়? এই যে আমাদের সংসারের সঙ্গে মাখামাখিতেও অনুকূল অনুভূতি হয়, তার পরিচয় কি? হ্যাঁ, 'সুখ' তার নাম ঠিকই কিন্তু আসলে মুখাভাস। 'অল্পে' মানে জগতে সুখ নেই। সুখ ভূমায়। এই সুখ দুঃখ পর্যায়বাচী। এই সুখ করণ জন্য। ভেদ যুক্ত। সসীম।

আমরা এই সুখ আসলে চাই না। যা চাই তা আনন্দ। সেই আনন্দ রাজ্যে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর যুগে যুগে বার বার এসেছেন। এবার শ্রীওঙ্কারনাথ বিগ্রহে তাঁর যে মহা আবির্ভাব তার মহিমা অপার। এবার তিনি অনন্তধারায় লোককল্যাণ করেছেন। প্রার্থীর যাবতীয় প্রার্থনা তিনি এবার অকাতরে পূরণ করেছেন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানকেও না চাইতে তুলে দিয়েছেন কলির জীবের হাতে! দেবরক্ষা, বেদরক্ষা, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, শৌচাচার, কর্তব্য পরায়ণতার শিক্ষাদান, তপস্যা, অধ্যয়ন, সময়ের সদ্ব্যবহার—কি শেখাননি তিনি এবার। মুহুর্মুহু সমাধি, তার সঙ্গে দেড়শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা তাঁরই পবিত্র বাণীবিগ্রহ। অদ্বৈত বেদান্তের নতুন দিক উন্মোচন করে প্রকাশ করেছেন অভিনব প্রণববাদ। পাশাপাশি ভক্তি ও শ্রীনামসঙ্কীর্তনের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন—আসমুদ্র হিমাচল। এই মহাজীবনের ছবি আঁকার ইচ্ছাকে মহাজনেও 'দুরাশা' বলে সম্ভ্রম প্রকট করেছেন। বড় আশার কথা এই যে, আমাদের অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সর্বাধীশ শ্রীমৎ বিঠ্ঠল মহারাজজী সেই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হয়েছেন; ওঙ্কারেশ্বরে 'সীতারাম-মহাসিন্ধু তীরে' মহাগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড তাঁর লেখনীমুখে আবির্ভূত হচ্ছেন। আমরা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। অপেক্ষায় থাকি।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রণব-প্রেমামৃত ভাষ্য

শ্রীশ্রীঠাকুর

[শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত চণ্ডী থেকে শ্রীশ্রীপ্রণব প্রেমামৃত ভাষ্যের শ্রীহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাই এখান থেকেই পাঠকের কাছে গ্রন্থটি নিবেদন করা হল। চণ্ডীর এক থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত ও শ্রীগুরু প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অনেকদিন পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মহামিলন মঠে পাওয়া যাচ্ছে। —সম্পাদক]

(পূর্বানুবৃত্তি)

সপ্তম অধ্যায়, চণ্ডমুণ্ডবধ

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম।
বভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্॥ ১৮

অন্বয় ঃ তানি অনেকানি চক্রাণি তন্মুখং বিশমানানি তথা বভূঃ যথা সুবহূনি অর্কবিম্বানি ঘনোদরং প্রবিশন্তি ভান্তি॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই মুণ্ড ক্ষিপ্ত চক্রসমূহ তাঁহার মুখে প্রবেশ করিয়া যেরূপ বহু সূর্য্যবিম্ব মেঘমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শোভিত হয় তদ্রূপ হইল॥ ১৮

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ তানি অনেকানি বহূনি চক্রাণি চক্রাস্ত্রাণি তন্মুখং তস্যাননং বিশমানানি বিশন্তি সন্তি তথা বভূঃ শুশুভিরেঃ যথা সুবহূনি অত্যনেকানি অর্কবিম্বানি সূর্য্যমণ্ডলানি ঘনোদরং মেঘমধ্যং প্রবিশন্তি সন্তি সন্তি॥

ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দ্দর্শদশনোজ্জ্বলা॥ ১৯

অন্বয় ঃ ততঃ ভৈরবনাদিনী করালবক্ত্রান্ত-র্দুর্দ্দদশনোজ্জ্বলা কালী অতি রুসা ভীমং জহাস॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ ঃ অনন্তর অতি ভয়ঙ্করনাদিনী করালবদনান্তর্গত ভয়ানক দশনপ্রভায় দীপ্তিমতী কালী অতি কোপভরে ভীষণ অট্টহাস্য করিলেন॥ ১৯

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ ততঃ অনন্তরং ভৈরবনাদিনী ভয়ঙ্কর শব্দকারিণী, ভৈরবং অতি ভয়ঙ্কর নদিতুং শীলং যস্যাং করালবক্ত্রান্তর্দুর্দ্দর্শদশনোজ্জ্বলা করালং ভীষণং যদ্বক্ত্রং তস্যান্তর্মধ্যে দুঃখেন দৃশ্যন্তে দুদর্দর্শা অতি ভয়ানকা যে দশনাস্তৈরুজ্জ্বলা দীপ্তিমতী। কালী দেবী অতিরুষা অতিক্রোধেন ভীমং ভীমং যথা স্যাৎ তথা জহাস অট্টহাসং কৃতবতী।

উত্থায় চ মহাসিং হং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্যকেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ॥ ২০

অন্বয় ঃ দেবী হমিতি মহাসিং উত্থায় চণ্ডং অধাবত অস্যকেশেষু গৃহীত্বা তেন অসিনা শিরঃ অচ্ছিনৎ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ ঃ দেবী কালী হম্ এইরূপ কোপাহ্বান্ শব্দ করিয়া মহাখড়্গ উত্তোলন পূর্বক চণ্ডাসুরেরপ্রতি ধাবিত হইলেন চণ্ডের কেশ গ্রহণ করত সেই অসির দ্বারা শিরশ্ছেদন করিলেন॥ ২০

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ দেবী কালী হম্ ইতি কোপাহ্বানশব্দং কৃত্বা মহাসিং মহাখড়্গাম্ উত্থায় উর্দ্ধীকৃত্য চণ্ডং চণ্ডাসুরং অধাবত অস্য চণ্ডস্য কেশেষ মুর্দ্ধজেষু গৃহীত্বা শিরঃ মস্তকং অচ্ছিনৎ চিচ্ছেদ।

প্রশ্ন ঃ মহাসিংহং উত্থায় এরূপ অর্থ কি হয় না?

উত্তর ঃ দেবীভাষ্যকার বলিয়াছেন—মহাসিংহং উত্থায় অধিষ্ঠায়। সকর্মক ধাতোরকর্মকত্ববত্তাৎকপর্য্যবশাদকর্মকধাতোং সকর্মকতবমপীতি বোধযম। সকর্মক ধাতুর তাৎপর্য্যবশে অকর্মকত্ববৎ সেইরূপ অকর্মক ধাতুর সকর্মকত্ব। যদ্বা মহা মহ্যতে পূজ্যতে অসৌ ইতি মহা অর্থ পূজ্যা, মহেহা রণোৎসবোহস্যা অস্তীতি অচি কৃতে মহারণোৎসববতী। দেবী কালী আসিংহং সিংহপ্রমাণপর্য্যন্তং সিংহের উল্লম্ফনস্থান পর্য্যন্ত লম্ফপ্রদানপূর্বক—ইত্যাদি অর্থ করিয়াছেন।

নাগোজী ও তত্ত্ব প্রকাশিকাকার মহাসিং মহাখড়্গাং এরূপ অর্থ করিয়াছেন।

অথ মুণ্ডোহপ্যধাবত্তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম।
তমপ্যপাতয়দ্ ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা॥ ২১

অন্বয় ঃ অথ মুণ্ডঃ অপি চণ্ডং নিপাতিতং দৃষ্ট্বা তাং

(কালীং) অধাবৎ, সা রুষা তমপি খড়্গাভিহতং কৃত্বা ভূমৌ অপাতয়ৎ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ ঃ চণ্ড বধানন্তর মুণ্ডাসুরও চণ্ড পিনাতিত হইয়াছে দেখিয়া কালীর প্রতি ধাবিত হইল। কালী সক্রোধে তাহাকেও খড়্গাঘাতে নিহত করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিলেন॥ ২১

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ অথ চণ্ডবধানন্তরং মুণ্ডঃ অপি চণ্ডং নিপাতিতং নিহতং দৃষ্ট্বা বিলোকা তাং কালীং অদাবৎ স কালী রুষা ক্রোধেন তং মুণ্ডং অপি খড়্গাভিহতং কৃত্বা ভূমৌ ধরণ্যাং অপাতয়ৎ।

হতহেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্য্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্॥ ২২

অন্বয় ঃ ততঃ হতশেষং সৈন্যং সুমহাবীর্য্যং চণ্ডং মুণ্ডঞ্চ নিপাতিতং দৃষ্ট্বা ভয়াতুরং সৎ দিশঃ ভেজে॥ ২২

বঙ্গানুবাদ ঃ মুণ্ডাসুর নিহত হইলে হতশেষ সৈন্যগণ সুমহাবীর্য্য চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত দেখিয়া ভীতান্তঃকরণে চতুর্দিকে পলায়ন করিয়াছিল॥ ২২

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ ততঃ মুণ্ড বধানন্তরং হতশেষং হতাবশিষ্টং সৈন্যং বলং সুমহাবীর্য্যং মহাবলং চণ্ডং মুণ্ডং চ নিপাতিতং নিহতং দৃষ্ট্বা অবলোক্য ভয়াতুরং ভয়ার্ত্তং সৎ দিশঃ ভেজে পলায়িতবৎ।।

শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্॥ ২৩

অন্বয় ঃ কালী চণ্ডস্য শিরঃ চ মুণ্ডং এব চ গৃহীত্বা চণ্ডিকাম্ অভ্যেত্য প্রচণ্ডাট্টহাস মিশ্রং প্রাহ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ ঃ কালী চণ্ড ও মুণ্ডাসুরের মস্তক গ্রহণপূর্বক চণ্ডিকার নিকটে আসিয়া তীব্র অট্টহাস্য যুক্ত বাক্যে বলিলেন॥ ২৩

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ কদ্কালী চণ্ডস্য শিরঃ মস্তকং চ মুণ্ডং সশিরস্কং সদেহং (নাগোজী)। (তত্ত্বপ্রকাশিকা) লক্ষণয়া মুণ্ডাসুরস্য মুণ্ডং এব চ গৃহীত্বা চণ্ডিকাম্ অম্বিকাং অভ্যেত্য আভিমুখ্যেন এত্য প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রং প্রচণ্ডস্তীব্রশ্চাসৌ অট্টো মহান্ হাসশ্চেতি তেন মিশ্রং যত্র কথনে যথা স্যাৎ তথা প্রাহ কথয়ামাস।

ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি॥ ২৪

অন্বয় ঃ অত্র যুদ্ধযজ্ঞে ত ব চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ ময়া উপহৃতৌ ত্বং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ স্বয়ং হনিষ্যসি॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ ঃ এই যুদ্ধযজ্ঞে আমি তোমাকে চণ্ডমুরড মহাপশু উপহার দিলাম তুমি শুম্ভ ও নিশুম্ভকে স্বয়ং হনন করিবে॥ ২৪

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ অত্র যুদ্ধযজ্ঞে যুদ্ধমেব যজ্ঞং হিংসায়াং স্বর্গদায়িত্বাৎ। তত্র তব সম্বন্ধে চণ্ডমণ্ডৌ মহাপশূ ময়া উপহৃতৌ উপঢৌকিতৌ ত্বং শুম্ভং নিশুম্ভং চ স্বয়ং হনিষ্যসি মারয়িষ্যসি।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধ যজ্ঞ?

উত্তর ঃ যজ্ঞে পশু আলম্ভন করিতে হয়, হিংসাতে স্বর্গ লাভ হয়, এ যুদ্ধও যজ্ঞস্বরূপ, ইহাতে হত হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। কালী বলিলেন---আমি মহাপশু চণ্ডমুণ্ডকে বিনাশ করিলাম, তুমি এইবার স্বয়ং শুম্ভ-নিশুম্ভকে নিহত কর।

-ক্রমশঃ

গুরুদেবের কৃপা ধন্যা

শ্রীমতী মিঠু চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া

ঃ যোগাযোগ ঃ

উপেন ব্যানার্জী লেন, সাতঘাট
গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলি
পিন- ৭১২১৩৭

ঃ দূরভাষ ঃ

(০৩৩) ২৬৮৩-২৯৪৭
৯৮৩১৫৮৪৭৯৩

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ

কিঙ্করী যোগমায়া দেবী

সময়ের চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আজ মানুষের মনেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগেকার দিনের মতো আজ মানুষ নিঃস্বার্থভাবে মেশে না এমনকি নিঃস্বার্থভাবে মেশার কথা ভাবতে পারে না। এজন্য মানুষ বিপদে পড়লে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু সদগুরু পেলে তার কোন চিন্তা থাকে না। চলতে ফিরতে সবসময় গুরু গুরু জপ করলে আপনাআপনি ভগবানের দরজাগুলো খুলে যাবে। রাস্তায় খালি পায়ে চলতে গেলে কাঁকড়, কাঁটা ফুটতেই পারে, তেমনি সাধনার পথেও অনেক বিঘ্নও থাকতে পারে। তবে গুরুর ওপর অটল বিশ্বাস রেখে সাধনার পথে নিজেকে সাবধানে থাকতে হবে।

গুরুদেব আছেন, ঠাকুর আছেন তবুও নিজেকে সাবধানে থাকতে হবেই। রামকৃষ্ণদেব গল্পের ছলে একথা বুঝিয়েছেন যে নারায়ণ বোধে সবাইকে প্রণাম করবে, একথা এক ব্যক্তি গুরুর কাছে শুনেছে। পথে এক হাতিকে দেখে তাকে প্রণাম করতে যায় নারায়ণবোধে কিন্তু পাগলা হাতী হওয়ায় মাহুত সকলকে পথ থেকে সরে যেতে বললেও লোকটি ভাবে আমি গুরুর কথা শুনছি আমার কোন বিপদ হবে না। পাগলা হাতী কিন্তু তাকে ছাড়ে না পদপৃষ্ট করবেই। গুরুদেব যেমন বলেছেন সকলের মধ্যে নারায়ণ আছে, অর্থাৎ মাহুতের মধ্যেও আছে, মাহুত সকলকে সরে যেতে বলেছিল; নারায়ণবোধে তার কথাও মান্য করা উচিত। তাছাড়া ভগবান নিজস্ব বুদ্ধি বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা দিয়েছেন তা দিয়েও নিজেকে সাবধানে থাকতে হবে। গুরুকরণ হলে গুরু সেকথাই বলেন।

একবার একজন বড় সাধক শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে গুরু ইষ্ট মন্ত্র একসঙ্গে কী করে ধ্যান আসবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন ইষ্ট ও মন্ত্রকে গুরুর ভেতর দিয়ে দাও কারণ স্বয়ং গুরুদেবের ভেতর থেকেই ইষ্ট ও মন্ত্র এসেছে। গুরু বলেন পিতামহ, পুত্র মন্ত্র এবং পৌত্র ইষ্ট। গুরুদেব রামমন্ত্র তোমার কানে দিলে তবেই 'রাম' হবেন ইষ্ট। ইষ্ট মন্ত্র গুরুদেবের ভেতর থেকেই বেরিয়েছে। এই ঐক্যকে স্মরণে রেখে জপ ধ্যান করতে পারলে সংশয় থাকবে না।

অনেকেই প্রশ্ন করেন সংসারে সকলের মধ্যে নানা কাজে ব্যস্ত থাকলে অনেক সময় আসন থেকেও উঠতে হয়। এর উপায় কী? শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, মনকে আসনস্থ রাখো। জপ হলো না বলে মায়েদের মনে কখনো যেন রাগ না আসে। কারণ কেউ ডাকলে বা কাজ থাকলে হাজার জপ করে গুণলেও তাতে কোনো লাভ থাকে না। কারণ জপ করবে মন; মন আসনে থেকে কোনো লাভ হবে না। কিন্তু জপ যদি মনের মধ্যে ঢুকে যায় তবে যেখানেই থাকা হোক না কেন ঠাকুরঘরে বা বাথরুমে তাঁকে জপলে কোন ক্ষতি হবে না। একজন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলে সবসময় তার মুখ দিয়ে 'নাম' বেরোচ্ছে। বাথরুমে মুখে কাপড় গুজলেও নাম হচ্ছে। কি উপায় হবে। ঠাকুর বলেন মন যার শুদ্ধ তার কোন কিছুর দরকার নেই। মন যাদের শুদ্ধ তাদের সবসময় জপ চলবে, এতে অসুবিধা নেই। ঠাকুরঘরে কোষাকুশি, পুষ্পপাত্র, চন্দনপীড়া, চন্দনকাঠ ফুল সবই আছে কিন্তু যারা সন্ন্যাসী মানুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে যারা সমর্পিতপ্রাণা তাদের এসব আড়ম্বরে প্রয়োজন নেই। তারা তখন সাকার থেকে নিরাকারে চলে গেছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম উপাসনায় তারা তখন মগ্ন। কোন সংস্কার নেই। শুদ্ধ-কাপড় পরা কি নয় তারা তা ভাবে না। যারা 'দুর্গা' জপ করে, দুর্গা-দুর্গা করতে করতে দুর্গাময় হয়ে গেলে সবের মধ্যে দুর্গাকেই দেখতে পাবে। তেমনিভাবে 'নাম' করতে থাকলে নামময় হয়ে যাবে তখন লোমকূপ দিয়েও নাম বেরোবে। সেবিকার প্রত্যক্ষ এই অভিজ্ঞতা আছে। নিজের চোখেই সে দেখেছে, নাইট্রিক অ্যাসিড ঢাললে যেমন জায়গাটা পুড়ে যায়, বিচুটি পাতা ঘষলে চুলকাবেই। তেমনি নাম করতে করতে 'নামময়' হতেই হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বারবার বলতেন 'একীভূত করে লও প্রিয়তম প্রাণ, আমার আমিকে নাম করো অবসান।' এই 'আমি'টিকে সরিয়ে দিতে হবে। আমাদের শরীর তো রক্তমাংস দিয়ে গড়া একটা খাঁচা।

যে ঘরে ঠাকুরকে, জগন্নাথকে বসিয়েছি তাকে ঠাকুরঘর বলি, সেরকম আমাদের মনকেও ঠাকুরঘর করে তুলতে হবে। আমাদের মনের ভেতরেও গুরু, ইষ্টকে বসাতে হবে। শুধু বসালেই হবে না; একদম কংক্রীট করে শক্ত করে বসাতে হবে। যাতে সংসারের শত বিপত্তিও সেখানে স্থান নিতে না পারে। গুরু-ইষ্ট সে স্থান অধিকৃত করে রাখলে শত অসুবিধার মধ্যেও মন থাকবে প্রশান্ত, প্রসন্ন। সংসারে নানা কালবৈশাখীর ঝড় এলেও মন ঠিক থাকলে সদ্‌গুরু ও সিদ্ধমন্ত্র থাকলে তিনি সামলে দেবেনই। 'নঃ যে ভক্ত বিনশ্যন্তি'—আমার ভক্তের কোন বিনাশ নেই। এইভাবে মনকে শক্ত করে তাঁর শ্রীচরণে দিতে হবে। ঠাকুরঘরে ময়লা জমলে যেমন পরিষ্কার করতে হয় তেমনি আমাদের ঠাকুরঘররূপ মনকেও পরিষ্কার রাখতে হবে; ভালো ভালো খাবার দিয়ে মনের পুষ্টি জোগাতে হবে। কারণ মনের ঘরের বিগ্রহকে প্রেম দিয়ে, আরতি করে, ভক্তির ধূপ জ্বেলে মানসে পূজা করতে হবে। মানসে পূজা করার অধিকারী কম। ধ্যানের মাধ্যমে এ সমস্ত তৈরি হয়। জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালা যায়। জ্ঞান কী? না তিনি যে তোমার ভেতর আছেন সেই উপলব্ধি হল জ্ঞান। অর্থাৎ সীতারাম ঠাকুর আমাদের মধ্যে আছেন এই উপলব্ধি হল জ্ঞান। এই উপলব্ধি হলে প্রেম দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে তাঁর আরতি করতে হবে। প্রেম অর্থাৎ যখন মন তার সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে জল হয়ে গেল তাই। ঠাকুরকে তখন পঞ্চপ্রদীপ নয় ভালোবাসা দিয়ে আরতি করবো। তাঁকে এমনভাবে অনুভব করবো যে তিনি কখনোই আর আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে ছেড়ে যেতে পারবেন না। গুরু ইষ্ট অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেই জ্যোতিদর্শন করবো আমরা বাইরের চোখ বন্ধ করে ভেতরের চোখ খুলে। এ এক অলৌকিক তত্ত্ব।

আমাদের অন্তরের মধ্যেও সিন্দুক আছে। সেখানেও আছে অনেক মণিমানিক্য। যখন আমিত্বের অহংকার চলে যাবে, প্রেম দ্রবীভূত হয়ে গুরু-ইষ্ট-মন্ত্র এক হয়ে যাবে তখন গুরুদেব স্বয়ং অন্তরের সিন্দুকের তালা খুলে দেবেন। জ্যোতি আপনি বেরিয়ে আসবে। যা জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান মণিমাণিক্য। তখন সমস্ত শরীর হবে রোমাঞ্চিত। ঠাকুর বলতেন তখন আপনি স্পর্শ, দর্শন সমস্ত কিছু অনুভব হবে। ভগবৎ দর্শন হবে। অন্তর হয়ে উঠবে রসে পরিপূর্ণ। মন ভরে উঠবে আনন্দে। তখন বাইরের ঝড়ের অনুভব আসবে না, ঠাকুরই শান্ত করে দেবেন। এরজন্য প্রয়োজন ভগবানকে বিশ্বাস। বিশ্বাসকে শক্ত করে ধরতে হবে। আমাদের পার্থিব জীবনে কষ্ট আছেই। কারণ প্রারব্ধ সে কষ্টের মূলে। চুরাশি লক্ষ জন্মের পর আমরা মনুষ্য রূপ পাই। কিন্তু সদ্‌গুরু থাকলে তিনি সমস্ত প্রারব্ধ ক্ষয় করে কষ্ট লাঘব করেন। মা যেমন ছেলে হাজার দুষ্টু হলেও তার সমস্ত কিছু সহ্য করে সন্তানের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করেন তেমনি শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিকল্প নেই। যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর সেবিকার বড় ছেলে চলে গেলে সেবিকার চোখ মুছিয়ে বলেছেন ''তুমি কাঁদবে না, একফোঁটাও জল বের করবে না, চুপ করো।'' তিনি সবসময় এভাবে আমাদের দুঃখহরণ করেছেন। নাহলে তো এরকম পুত্রশোক বা অন্যান্য শোকে আমরা পাগল হয়ে যেতাম। সেবিকার আজ পায়ের জোর কমে এসেছে, একদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেবিকার তেমন ব্যথাই লাগেনি। স্বয়ং গুরুদেব যদি না ধরতেন মাথা ফেটে যেত নয়তো অন্য বিপদ হত। কিন্তু মাথা তো ফাটেইনি, মাথার ব্যথাও তিনি নিয়ে নিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের এত দিচ্ছেন কিন্তু আমরা কি দিচ্ছি? ঠাকুর বলেন ''তোমাদের সমস্ত সত্ত্বা আমাকে দিয়ে দাও।'' অর্থাৎ ''আমার আমিকে নাথ করো অবসান।'' আমাদের অহং আমাদের নামাতে চেষ্টা করছে; তাকে দূর করতে হবে। সেবিকার আজ বয়স হয়ে গেছে, শরীরের জোরও কমে গেছে। তবুও আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করে যেতে হবে। নতুন প্রজন্মকে ঠাকুরময় করে ভালোবাসার কাঙাল করে তুলতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সৃষ্টিকে রক্ষা করতে হবে। তিনি বারবার অবতাররূপে ধরাধামে এসেছেন —কখনো রাম কখনো কৃষ্ণরূপে এসে মানুষের মনে চেতনার আলো জ্বালিয়েছেন। তাঁর শরণাগতদের তিনি সবসময় রক্ষা করছেন এবং করবেন। তাই শুধু সবসময় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ মননে আমাদের থাকতে হবে।

—আজ তোমার কাছে মোর একটি নিবেদন
ক্ষণিকের তরে ভুলিও না যেন শ্রীগুরুস্মরণ।
স্মরণ তোমার ভুলিনা যেন এই মোর প্রার্থনা
তব চরণে লহ হে প্রণাম মোদের সবার।।

সব তুমি

শ্রী অরূপ কর

সকল সাধনার সার হল 'সব তুমি' দর্শন। তা এই 'সব তুমি' দর্শন কি করে হবে? ঠাকুর বলেছেন—সব তুমি সব তুমি জানলেই মোক্ষ হয়। এই মোক্ষ লাভের উপায় বলতে গিয়ে ঠাকুর বলেছেন—আগে সাত্ত্বিক আহার, তারপর যথাকালে উপাসনা। যথাকাল কি? ত্রিসন্ধ্যা, এই ত্রিসন্ধ্যা (প্রতি সন্ধ্যায় ৪৮ মিনিট করে সন্ধ্যা থাকে) হল ভগবানকে ডাকার সময়। সাত্ত্বিক আহার এবং যথাকালে উপাসনা করলে খুব সহজেই আমাদের রজঃ, তমঃ গুণ চলে যাবে। আর আমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হবে। সত্ত্বগুণের লক্ষণ হল মন ভগবানের দিকে আকর্ষিত হবে। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আসবে। মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য যে ভগবান লাভ—এটি বুঝতে পারব। তখনই Higher Thought আসবে, উচ্চ সংকল্প করতে পারব। সত্ত্বগুণের লক্ষণ হল জ্ঞানের প্রকাশ। মুখ দিয়ে শুধু ভগবানের কথা বের হবে। অন্য কিছু বলতে গেলে ভগবানের দিকে মন চলে যাবে। সারাটাদিন ভগবানকে নিয়েই থাকতে ইচ্ছা করবে। আসলে আমরা প্রত্যেকেই তো জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, সকলনামরূপ বর্জিত—অরূপ, যাকে মুখে বলা যায় না ---অব্যক্ত। আমরা সকলেই যখন জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ তখন আমাদের এই অজ্ঞানতা ও দুঃখ কেন? এর কারণ প্রকৃতির দুই গুণ—তমঃ ও রজঃ। আত্মা (যা পরমাত্মার সাথে অভেদ) -কে ঘিরে প্রকৃতির এই দুটি গুণ অজ্ঞানতা ও দুঃখ প্রদান করে। আসলে সুখ, দুঃখ, ভ্রান্তি এসব মনের হয়। আমরা কি করি? আমরা সুখ, দুঃখ প্রকৃতির এই গুণগুলি আত্মার উপর আরোপ করি। তাই কখনও নিজেকে সুখী কখনও দুঃখী কখনও অজ্ঞ মনে করি। সুখ, দুঃখ, অজ্ঞানতা এসব কিন্তু আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। অবিদ্যার (মায়া) জন্যই আমরা প্রকৃতির এই দুটি গুণকে আত্মার উপর আরোপ করি। সত্ত্বগুণ বাড়লে আত্মা প্রকাশিত হবে—অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হবে। প্রথম প্রথম খণ্ড খণ্ড হিসেবে আমরা সকল বস্তুতে ভগবানের শরীর বলে আরোপ করতে পারব। সত্ত্বগুণ আরও বাড়লে এবার অখণ্ডভাবে সকল বস্তুতে ভগবানের শরীর বলে আরোপ করতে পারব। গীতায় ভগবান বলেছেন—"যিনি সকল ভূতের মধ্যে আমাকে দেখেন এবং আমার মধ্যে সকল ভূতকে দেখেন তার কাছে আমি অদৃশ্য হই না। সেও আমার কাছে অদৃশ্য হয় না।" অর্জুন বললেন এর দীর্ঘস্থিতি আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিছুদিন হয়ত অখণ্ডভাবে সকল বস্তুতে ভগবানকে আরোপ করলাম কিন্তু তারপরই আবার গাছ, নদী, কুকুর এইসব দেখছি। এর উপায় কি? উপায় বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন —অভ্যাস এর দ্বারা সব তুমি দর্শন সম্ভব। অভ্যাস কি? ঠাকুর সহজভাবে বললেন—সর্বদা দুর্গা দুর্গা করা, রাম রাম করা, শিব শিব করা, মা মা করা, হরি হরি করা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করা বা গুরু গুরু করাই সেই অভ্যাস। সর্বদা ভগবানের নাম জিভে থাকলে আমরা ঠিক বুঝতে পারব—আমি মায়ের কোলে আছি। আমি যে নিরাশ্রয় নয়, তিনি যে সর্বদা আমাকে কোলে করে আছেন—সেটি বুঝতে পারব। তখন শুধু 'তুমি'ই থাকবে। দেহ অভিমান চলে যাবে, ক্ষেত্র ক্ষেত্র বিভাগ যোগ পাকা

হবে। সব তুমি অখণ্ডভাবে দেখতে পাব। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন এরপর আরও উঠতে হবে। এখন যেটা করছিস এটা আরোপ করছিস। এরপর সত্যি সত্যিই ঐ পাহাড়টার সাথে কথা বলবি। আমরা জানি শাস্ত্র বলেছে—পূর্ব শতশত জন্ম কৃষ্ণকে উত্তমরূপে পূজা করলে তবে এজন্মে জিভে সর্বদা নাম ধরে রাখা যায়। শিষ্যের গুরুদেবের প্রতি অনুযোগ—হে ঠাকুর পূর্বজন্মের কোনো পাপকর্মের জন্য তুমি আমায় নাম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছো। আমায় কৃপা কর, আমাকে নামের মধ্যেই ডুবিয়ে রাখো। সর্বত্র ভগবানকেই দেখলে আমাদের ভয় চিরতরে দূর হবে। কারণ ভয়ের কারণই হল দ্বৈতজ্ঞান। সর্বদা রাম রাম করতে থাকলে বুঝতে পারব—জপ করাচ্ছো তুমি, জপ তুমি, যার মধ্য দিয়ে করাচ্ছো অর্থাৎ এই দেহটা তুমি, মনও তুমি, যেখানে অবস্থান করে জপ করছি সেটিও তুমি—তোমার কোল। ঠাকুর বলছেন—তুই নিজেকে আমার থেকে আলাদা করে ভোগ করতে চাইছিস? তুই নিজেকে রাম থেকে আলাদা করে আমির ছাপ মেরে রামকে ছোট করিস না। সত্যিকথা বলতে আমি বলে কোন অস্তিত্বই নেই। আছে শুধু 'তুমি'—ছিলাম আমি থাকব আমি, আমি আছি চিরকাল'। শুধু তুমিই থাকো। তুমির মধ্যে থেকে তুমিই রাম রাম করো। এটাকে নিশ্চিহ্ন করে দাও। ঠাকুর বলছেন—মা আমাকে এটিই ভুলিয়ে দিও না যে আমি তোমার কোলে আছি—কারণ এটি ভুলে যাওয়াই মায়া। গীতায় ভগবান বলেছেন—যিনি নিরন্তর আমার ভজনা করেন তিনিই তম, রজঃ ও সত্ত্ব---এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করতে পারেন। ভগবান অর্জুনকে আরও বলেন—''হে অর্জুন তুমি আমার কৃপায় সকল বাধা অতিক্রম করে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু অহঙ্কারবশতঃ যদি আমার কথা না শোনো তবে বিনষ্ট হবে।'' গীতার এই বাণী ঠাকুর আরও সহজভাবে বললেন—''আমি তোর আগে আগে যাচ্ছি আর রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে যাচ্ছি, তুই নাম নিয়ে আমায় দেখতে দেখতে পিছু পিছু আয়।'' ব্যস্ তারপর আমরা পৌঁছে যাব সেই আনন্দের রাজ্যে—

''আনন্দই এ বিশ্বের মূল উপাদান।
আনন্দ হইতে জাত আনন্দে বিশ্রাম॥
আবার ডুবিয়া যাবে আনন্দমাঝারে।
আনন্দ আনন্দ শুধু ত্রিবিশ্ব সংসারে॥''

— পথের আলোর গ্রাহকবৃন্দের প্রতি আবেদন —

দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অনেকেই বেশ কিছু বৎসরের বাৎসরিক উপায়ন এখনও জমা দেননি। তাঁদের প্রতি বিশেষ আবেদন সত্বর বাৎসরিক উপায়ন পাঠিয়ে ঠাকুরের সেবায় ব্রতী হোন। মানি অর্ডার-এ উপায়ন পাঠাবার সময় 'পথের আলো' কথাটি এবং গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করুন। প্রতিটি যোগাযোগের ক্ষেত্রে দয়া করে পিনকোড নং এবং টেলিফোন নং ব্যবহার করুন।

কৃপার কণা

শ্রীমতি দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়

না হয় আমার নাই সাধনা
করলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল
চকিতে ফল ফলবে না
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত ঠাকুরের সঙ্গে দু'চারটে লীলার ঘটনাপ্রকাশ করছি তাও আমার ইচ্ছায় নয়, ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য পরম প্রেমময়, একান্ত সেবক এবং ঠাকুরের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ সমীরণদাদা পুরীর আশ্রমে ১০ই বৈশাখ যা-যা নাম দিগে যা উৎসবে প্রতিবছর বলতেন তোদের সঙ্গে ঠাকুরের অনেক লীলা হয়েছে দু-একটা লিখে দে পত্রিকাতে ছাপাবো, তাই তাঁর প্রচেষ্টায় লিখতে বাধ্য হয়েছি।

চার বছর বয়স থেকেই ঠাকুরের সঙ্গে ছিলাম। বাবা-মা ঠাকুরের ভোগ রান্না করতেন। দাদারাও আশ্রমে ঠাকুরের সেবায় কাজে লেগে থাকতেন। এককথায় বলতে গেলে ঠাকুর আমাদের পরিবারটাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। ঠাকুরই আমাদের সব কিছুর গার্জেন। আমাদের তিন বোনের বিয়ে দেওয়া, দাদাদের পৈতে দেওয়া, আমাদের সংসার চালানো সব দায়িত্ব ঠাকুর নিয়েছেন।

প্রতি চাতুর্মাস্যে বাবা-মাকে ডেকে পাঠাতেন, ওদের সঙ্গে আমাকেও যেতে হত কারণ চার বছরের মেয়ে কোথায় থাকব তাই আশ্রমই ছিল আমাদের ঘরবাড়ি। দুবার দ্বারকায়, চারবার ঋষীকেশে, পাঁচবার পুরী, চারবার গঙ্গাসাগর, তিন-চারবার মহামিলন মঠে চারমাস করে থাকতাম। ষোলো বছর পর্যন্ত বেশীরভাগ ঠাকুরের কাছেই থেকেছি। বাবা-মা ঠাকুরকে বাবা বলতো তাই আমি দাদুভাই বলতাম। যখন যেটা দরকার হত দাদুভাইকে বলতাম। দাদুভাই মনস্কামনা পূর্ণ করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে অনেক লীলাই হয়েছে সব বলতে গেলে একটা বই লিখতে হয়, ঠাকুর যদি লেখান লিখবো। বর্তমানে দু-চারটে লীলার কথা লিখছি।

চাতুর্মাস্য মানে অখণ্ড নাম, পাঠ, প্রার্থনা, বিরাট অন্নছত্র, প্রচুর গুরুভাই বোনেদের সমাগম। একটা স্বর্গীয় আনন্দ সর্বদা বিরাজ করতো। ভজন হত তার সঙ্গে ভোজনও ভালরকম চলত। আমি বাচ্চা মেয়ে ভোজনের দিকেই আমার ঝোঁকটা ছিল বেশী। বাবা-মা ঠাকুরের ভোগ রান্না করতো। সেই ভোগ দাদারা 'রাসবিহারীর আজীম ঠাকুরকে খাওয়াতো আমি দরজার গোড়ায় বসে থাকতাম।'

ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেলে দাদারা কলাপাতায় করে আমাকে দিত আমি সেই মহাপ্রসাদ নিয়ে ছুটে মার কাছে চলে যেতাম আর ব্রহ্মচারী মায়েরা আমার পিছন পিছন ছুটতো একটু প্রসাদের জন্য, আমি কাউকে দেবো না, মা বলতো ঠাকুরের প্রসাদ সকলকে দিয়ে খেতে হয়। তখন বাধ্য হয়েই সকলকে একটু একটু দিতাম। এইরকম বিভিন্ন চাতুর্মাস্যে চারমাস করে চলতো।

ঠাকুর আমার নাম দিয়েছিলেন দুর্গা, মেজোবোনের নাম শ্যামা, বড় বোনের নাম ইন্দিরা, চার ভাইয়ের নাম রামদাস, গোবিন্দদাস, কানাই, বলাই, বাবার নাম নির্ভয়ানন্দ, মার নাম কৃপাময়ী। গঙ্গাসাগর চাতুর্মাস্যে ঠাকুরকে একদিন বললাম দাদুভাই আমাকে একটা রাধা দেবে। দু'চারদিন পরে জয়পুর থেকে ছোট্ট শ্বেতপাথরের রাধা এনে ঠাকুর আমাকে খুঁজছেন আমি তখন বড়জামাইবাবু রত্নেশ্বর যাকে ঠাকুর ছোটবেলা থেকেই কাছে রেখেছিলেন। আমার বড়দির সঙ্গে ঠাকুর সারারাত জেগে দিগশুই আশ্রমে বিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ জামাইবাবু ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী। ঐ জামাইবাবুর সঙ্গে সাগরের ধারে

বেড়াতে গেছি আর ব্রহ্মচারী মায়েরা বলতো এই দুর্গাঠাকুর তোকে রাধা দেবে বলে খুঁজছে আর তুই এখানে ঘুরছিস। আমি ছুটে গিয়ে ঠাকুরকে বললাম দাদুভাই আমায় রাধা দাও। ঠাকুর সুন্দর ফুটফুটে একটি শ্বেতপাথরের রাধা আমায় হাতে দিয়ে বললেন এর নাম 'রাইকিশোরী' রোজ ভোগ দিবি আর যে বাড়ীতে ডিম পিঁয়াজ ওঠে না সেইখানে রাখবি।

ঠাকুর ছোট্ট একটা কাচের ভ্যানে করে যোগেন্দ্রমঠ থেকে সাগরে স্নান করতে যেতেন। আমার তখন সাত-আট বছর। আমি রাইকিশোরীকে নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে ঐ ভ্যানে উঠে ঠাকুরের সঙ্গে সাগরে যাবো বলে বায়না করতাম। ভাস্করদা (শরণানন্দ) আমাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না। আমি তখন বলতাম দাদুভাই আমায় উঠতে দিচ্ছে না। ঠাকুর তখন বলতেন এই দুর্গাকে উঠিয়েছে তখন আর কারো কিছু বলার নেই কারণ সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার। আমি রাইকিশোরী আর ঠাকুর তিনজনে বসতাম আর সবাই ভ্যান ঠেলে নিয়ে যেতো আবার স্নানের পর ঐ ভ্যানে আশ্রমে ফিরতাম। ঐ রকম প্রায়ই ঘটত।

বিভিন্ন আশ্রমে চারমাস করে অনেক লীলাই চলতো। তারপর ১৫ বছর বয়স হতেই মা বললেন বাবা মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তখন ঠাকুরের সঙ্গে আমরা ছিলাম পুষ্করে। ঠাকুর বললেন সীতারামের মেয়েদের পাবার জন্য শিব বাবারা তপস্যা করছে তুই চিন্তা করছিস কেন? তার ছয়মাস পরে ১৫$^{১}/_{২}$ বছর বয়সে ঠাকুর বললেন পাত্র দেখো সীতারাম বিয়ের ব্যবস্থা করবে।

বাবা-মা পাত্র দেখে ঠাকুরকে বললেন বাবা পাত্র আপনার আশ্রিত তার মা-ভাইরাও আপনার আশ্রিত। ঠাকুরবাড়ী, শিবের মন্দির। ঠাকুর সব শুনে বিয়েরদিন ঠিক করলেন। ১৪ই ফাল্গুন মধুমাসে বিয়ের দিন স্থির হল।

বালকানন্দকে বললেন কাশীনাথের ছোটো মেয়ে দুর্গার বিয়ে ১০ ভরি সোনা দিয়েছে। বালকদা দুদিনের মধ্যেই ১০ ভরি সোনা দিয়ে দিল। জয়গুরু সম্প্রদায়ের কোষাধ্যক্ষ রামেশ্বর দাগাকে বললেন দুর্গা বিয়ের ১০ হাজার টাকা দিয়ে দাও। রামেশ্বর দাগা ১০ হাজার টাকা দিলেন। তখন সর্বাধীশ তারক জেঠুকে লিখলেন মহামিলন মঠে বড় বড় কাঁসার বাসন দানের জন্য কাশীনাথকে দিও। বাবা-মা ঠাকুরের চিঠি নিয়ে ঋষীকেশ থেকে চলে এলেন। বড়বড় সরঞ্জাম দানের বাসনপত্র নিয়ে আসা হল। যথাসময়ে ঠাকুরের আশীর্বাদ আমার বিয়ে হয়ে গেল।

তার চার-পাঁচ মাস পর ঠাকুরের শেষ চাতুর্মাস্য মাদ্রাজের শ্রীরঙ্গমে শুরু হল। ঠাকুর জয়নগরে বাবাকে চিঠি দিলেন নতুন মেয়ে জামাইকে নিয়ে শ্রীরঙ্গমে চলে আয়। আমরা খুব আনন্দ করে শ্রীরঙ্গমে গেলাম। ঐটাই আমাদের হনিমুন। সন্ন্যাস গুরু ফলাহার ডিউরে মঠে চাতুর্মাস্য শুরু হয়েছিল। আমার মা বললেন বাবা এই তোমার দুর্গা আর ছোটো জামাই। আমার স্বামী একটা সিল্কের নামাবলি ঠাকুরের গায়ে পরিয়ে দিল তারপর আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। আমি একটু আগে উঠে মাথা বাড়িয়ে দিতেই ঠাকুর বললেন দাঁড়া আগে তোর বরকে আশীর্বাদ করি, বরের বাঁদিকে থাকতে হয়। ডান হাতে আমার স্বামীর মাথারও ওপর দিয়ে আশীর্বাদ করলেন তারপর আমাকে। আমরা উঠে দাঁড়াতেই ঠাকুর গায়ের চাদরটা আমার স্বামীকে দিলেন। শ্রীঅঙ্গের অমূল্য সম্পদ দিয়ে জামাই-এর মুখ দেখলেন।

আগে থেকেই ঠাকুর আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা সেখানে চলে গেলাম। পরেরদিন আলুর তরকারি, মুড়ি, চা খেয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করতে গেছি। প্রণাম করে উঠতেই ঠাকুর বললেন, তোদের আজ দীক্ষা দেবো। আমরা বললাম বাবা আমরা তো খেয়ে এসেছি। ঠাকুর বললেন তা হোক এ মুখ থেকে যখন বেরিয়েছে তখন আজই দীক্ষা হবে 'যা আসন নিয়ে আয়।' তোষানন্দ কাকুর কাছ থেকে দুটো আসন ঠাকুরের নাম করে নিয়ে এলাম। দরজা বন্ধ করে ঠাকুর আর আমরা দুজন। দীক্ষার পর মন্ত্র ব্যাখ্যা করতেন তারপর মন্ত্র কাগজে লিখে দিতেন।

ঐরকম গুরু + হরে কৃষ্ণ, ইষ্ট, ইষ্ট চৈতন্য, ইষ্টগায়ত্রী, ব্রাহ্মী তারপর অজপা পরপর ছদিন। দরজা বন্ধ করে প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলতো দীক্ষার পর। তখন বাইরে VIP দের ভীড় ঠাকুরের ঘরের দরজা বন্ধ কেউ ঢুকতে পারছে না। মেডিকেল কলেজের সার্জারির হেড

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষামন্ত্রী কাশীনাথ মৈত্র ডঃ লাহিড়ি দা সব ভীড় করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ভীড়ের মধ্যে একজন বলছে কাদের দীক্ষা হচ্ছে রোজ সকালে ঠাকুরের ঘরে দরজা বন্ধ। দ্বারি যদুপতিকাকু বলতেন কাশীনাথদার ছোটো মেয়ে ও জামাই-এর দীক্ষা হচ্ছে। একজন ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন ঠাকুর কি ওদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন রোজ এতক্ষণ দরজা বন্ধ। আর একজন রসিকতা করে বলতেন স্বর্গে নিয়ে যাবে কি ওরা তো স্বর্গে আছে স্বয়ং বৈকুণ্ঠের নারায়ণের সঙ্গেই রয়েছে। ঐরকম রঙ্গরসিকতা চলতো।

শেষদিন অজপা দেবার সময় ঠাকুর তিনটে বর দিলেন। বললেন গু মানে অজ্ঞান রু মানে জ্ঞান, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের পথে যিনি নিয়ে যান তিনিই গুরু। গু মানে অন্ধকার রু মানে আলো, অন্ধকার থেকে আলোর পথে যিনি নিয়ে যান তিনিই গুরু। আজানুলম্বিত বাঁ হাত ওপরের দিকে তুলে বললেন তোদের করতে হবে না আপনি হবে।

তারপর প্রতিদিন ঠাকুরের গলায় দুজনে মালা পরিয়ে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতাম। প্রণাম করে উঠতেই ঠাকুর মালা দুটো আমাদের গলায় পরিয়ে দিতেন। ঐখানেই ঠাকুর আমার স্বামীর নাম দেন গিরিনানন্দ।

ফলাহারি ডিউটের মঠ থেকে রেড্ডিয়ারছত্রম রাজপ্রাসাদে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হল। গেটের কাছে হাতি রেখে অভ্যর্থনা করা হল। গঙ্গাজল দিয়ে ঠাকুরের শ্রীচরণযুগল ধুইয়ে দেওয়া হল। ঠাকুরের পাশে ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হল। ঠাকুরকে নিত্য হাওয়া করা, গল্প করা, কত লীলাই হত তার ইয়ত্তা নেই। এককথায় বলতে গেলে সীতারাম আমাদের রক্তে মিশে গেছে। ঠাকুর বলতেন জন্ম-জন্মান্তরের মহা সাধনার ফলে সীতারামের সঙ্গ করছিস। ঠাকুরের বহু উপদেশ পেয়েছি তবে আমরা যেটা সার বুঝেছি ''নাম ও প্রণাম'' এ দুটো অস্ত্র থাকলে আর তার কোন কিছুতেই ভয় থাকে না। আর একটা জিনিস যতই বিপদ আসুক দুফোঁটা চোখের জল গুরুপাদুকাতে দিলে সব বিপদ কাটবেই। এটা আমাদের পরিস্ফৃত সত্য।

নয়নের জল বীণা পূজা উপাচার
আর কিছু নাহি চান ঠাকুর আমার।

ব্রাহ্মীমন্ত্র দেবার পর ঠাকুর ব্রাহ্মী প্রণাম মন্ত্রটা আমাদের বলে দিলেন—

নমস্তে পরম ব্রহ্ম মনস্তে পরমাত্মনে
নির্গুণায় নমস্তুভ্যাং সৎ কৃপায় নমঃ নমঃ।
সুখের আশায় তুমি সতত আকুলা
ক্ষুদ্র সুখ সুখ নহে শুনরে বাতুল।।
জ্বালা মাখা সুখ হেথা জানত সকল।
সে সুখ লভিতে কেন হয়েছ বিফলা।
সুখের সাগর আছে অন্তরে তোমার।
রাম রাম জপি ডুব দাও একবার।।
পাইবে পরমানন্দ অভয় অমৃতা
ভূমা সুখে ডুবে যাবে কহিনু নিমিত।।
সৎ গুরু যার ভয় কিবা তার
জীবন পথে চলতে
ধন্য আমি তৃপ্তজীবন
সীতারাম বলতে।।
জয় গুরু জয় নাম, জয় ভগবান

লেখকদের প্রতি আবেদন

'পথের আলো'র লেখক-লেখিকাগণকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁরা (সবাই নয়) প্রকৃত লেখা পাঠাচ্ছেন না। জেরক্স কপি পাঠাচ্ছেন। এরজন্য পত্রিকাতে ছাপাতে অসুবিধা হচ্ছে। আপনারা দয়া করে আপনাদের প্রকৃত লেখা পাঠাবেন এবং পরিষ্কার হরফে পাঠাবেন।

বিভাসতীর্থ

শ্রী প্রদীপ দাস

ইতিহাস প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত; বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহর। আর এই শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গভীমা। ইতিহাসে তমলুকের নাম তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত বা তমেলিপ্তি বা দামলিপ্তি বা বিষ্ণুগৃহ বা বেলাকুল ছিল। পণ্ডিতদের অনুমান প্রাচীন যুগে বাংলা দ্রাবিড় জাতির বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এরাই বঙ্গদেশ থেকে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিল, তাম্রলিপ্ত বা তমেলিপ্ত থেকে তামিল জাতির নামকরণ হয়েছে। মহাভারতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত উল্লেখ আছে। তাম্রধ্বজ রাজার রাজধানী ছিল। এখানে সুপ্রসিদ্ধ বন্দর নগরী ছিল। পোত নির্মাণ ব্যবস্থা ছিল। লোকপ্রবাদ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার তৈরী রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত। হাওড়া-খড়্গপুর লাইনে মেচেদা স্টেশনে নেমে, মেচেদা-হলদিয়া বা রিক্সা তমলুক এস.ডি.ও. অফিসে নেমে পায়ে হেঁটে ১/২ কিমি. গেলে 'বর্গভীমা' মায়ের মন্দির। মায়ের একান্নপীঠের অন্যতম সপ্তত্রিংশং (২৭তম) শক্তিপীঠ হল বিভাসতীর্থ। এই বিভাসের বর্তমান নাম তমলুক। দেবী এখানে ভীমরূপা বা কপালিনী। পুরাণে উল্লেখ রয়েছে, শিবহীন যজ্ঞে যখন সতী অপমানিতা হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন তখন শিব দক্ষযজ্ঞ নাশ করে সতীর দেহকে নিজের কাঁধে তুলে বিশ্ব পরিক্রমা করেছিলেন। বিশ্ব ধ্বংস হওয়ার উপক্রম দেখে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেন। যেখানে যেখানে সতীর দেহাংশ পড়েছে সেখানেই একটি করে শক্তিপীঠ গড়ে উঠেছে। বিভাসক্ষেত্রে (তমলুক) পড়েছে সতীর বাম গুল্‌ফ। দেবীর নাম ভীমরূপা হলেও অগণিত ভক্তের কাছে ইনি বর্গভীমা নামে পরিচিতা। দেবী বর্গভীমার ভৈরব কপালী বা সর্বানন্দা। এক কৃষ্ণবর্ণে প্রস্তরে দেবীমূর্তি দৃশ্যমান। যুগযুগ ধরে দেবী এখানে ''কৃষ্ণবর্ণাং চতুর্ভূজাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। / দক্ষিণে খর্গশূলঞ্চ তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।। / বামে খর্গরমুণ্ডঞ্চ লোলজিহ্বা ত্রিলোচনাম্। ব্যাঘ্রচর্ম পরীধানাং ভীমাদেবী শবসনাম্।।'' এই ধ্যান মন্ত্রে পূজিতা হচ্ছেন। মহাশক্তিপীঠের প্রতিষ্ঠা কবে হয়েছিল তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে একথা বলা যায়, অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রাচীন এই ধর্মক্ষেত্র। বর্গভীমাও তার মন্দিরকে নিয়ে বহু কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। বর্তমান মন্দিরের পাশে একটি জলাভূমি আছে। স্থানীয় প্রবাদ অনুযায়ী সমুদ্রমন্থনের সময় দেবতারা নাকি এই জলাভূমিতে অমৃতকুম্ভ লুকিয়ে রেখেছিলেন। ময়ুরবংশীয় রাজা তাম্রধ্বজের শাসনকালে এক জেলে বৌ এই রহস্যময় কুণ্ডর জল ছিটিয়ে মরা মাছ জীবন্ত করেছিল।

রাজা কথাটি শুনে অলৌকিক কুণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে এলে, কুণ্ডটি অদৃশ্য হয়ে যায়, বদলে চতুর্ভূজা দেবী মূর্তির সাক্ষাৎ পান। সেই স্থানে বর্তমান মন্দিরটি রয়েছে। জনপ্রবাদ কৈবর্তরাজবংশের স্থাপক কালু ভুঁইঞা বর্গভীমা দেবী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে শিব দক্ষকে নিহত করলে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপে দক্ষের ছিন্ন শির বর্গভীমা হাতে আবদ্ধ হয়ে যায়। ১৬০০ বছরের পূর্বে মন্দিরটি নির্মিত। হিন্দু স্থাপত্যের শৈলীর স্থানীয় শিল্পরীতির নিদর্শন এবং বৌদ্ধ স্থাপত্যের নৈপুণ্য মন্দিরের চতুর্দিকে দেখা যায়। ধনপতি সদাগর বাণিজ্যযাত্রার সময় এই পুণ্যভূমিতে এসে দেবীর অলৌকিক কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শোনা যায় একসময় কালাপাহাড় নামের এক মুসলিম সেনাধ্যক্ষ বর্গভীমার মন্দিরটি ধ্বংস করতে এসে দেখেন তার সামনে স্বয়ং বর্গভীমা দাঁড়িয়ে আছেন। মায়ের নির্দেশে তিনি দেবীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে ফিরে যান। মহাদেবী বর্গভীমা হিংস্র ধ্বংসকারীকে দয়ালু শান্তিকামী

করে তোলেন। দুরাত্মাকে মহাত্মা করেন। মূককে বাচাল করেন।

স্বাধীনতার পূর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাম্রলিপ্ত শহরে প্রবেশমাত্র মা বর্গভীমার আশীর্বাদ মাথা পেতে নিতেন। প্রাচীন যুগে বাংলা দ্রাবিড়জাতীর বিশেষ প্রাধান্য ছিল। বাঙালির মতো ঈশ্বরকে ''মা'' বলতে পৃথিবীর কোন জাতি পারেনি। ভারতের আদিমতম জাতিরাই মাতৃদেবতার প্রথম উপাসক।

বৈদিক ধারা মূলত পুরুষ প্রধান। তান্ত্রিকধারা মাতৃপ্রধান দ্রাবিড় জাতির ছিল মাতৃ উপাসক। প্রতিদিনই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তের ভীড় দেখে অবাক হতে হয়। আজকে বৈজ্ঞানিক যুগে দেবীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। যাইহোক মন্দিরের প্রাঙ্গণ ভূমি হইতে ১৫/১৬ সিঁড়ি উত্তরণ করে মিষ্টি ফলাদি দিয়ে ''কাল ভয়হারিণী মা''-এর পূজাপাঠ দিলাম ও মন্দির প্রদক্ষিণ করা হল। ব্রহ্মময়ী মা-এর মূর্তি যেন আমাদের কালীঘাটের মায়ের মূর্তির প্রতিবিম্ব। এখানে বন্ধ্যানারীরা সন্তান লাভের আশায় ছুটে আসেন। দেবীর কাছে ''মানত'' করেন। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় সফল হওয়ার আশায় দেবী বর্গভীমা করুণাময়ী মার কাছে আশীর্বাদ নিতে আসেন, নতুন জীবন সৌভাগ্য কানায় কানায় ভরে তোলার আশায় হাজার হাজার নবদম্পতী দেবী ইচ্ছাময়ী মার সম্মুখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দেবী বর্গভীমার মন্দিরে প্রতিদিনই অসংখ্য বিয়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সবদিনই বর্গভীমার পূজা হয় তবে প্রতি শনি মঙ্গলবার দেবীর উদ্দেশ্যে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা থাকে। কি মনে করে, মানিকতলা দিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম। এক কিলোমিটার হাঁটার পর কাছাকাছি থেকে ''নাম'' এর আওয়াজ শোনা গেল রাস্তার বামদিকে দক্ষিণ-উত্তরমুখী একটি আশ্রম; দাঁড়ালাম, লেখা রয়েছে অনন্ত শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের 'সতীসংঘ' আশ্রম। মধ্যাহ্ন ভোগ আরতির রাগে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

নাম হচ্ছে। শুনলাম। আহা ঠাকুরের কি মহিমাঘন ভরে আশ্রমের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে যথারীতি বাড়ী অভিমুখে রওনা দিলাম।

ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির ধারণস্তম্ভ ব্রহ্মীভূত জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ মহারাজ সঙ্গে পুণ্যশ্লোক স্পন্দিত পঞ্চানন তর্করত্ন ভারতীয় দর্শনে তাঁহার স্বাধীন অবদানের নাম স্বরূপাদ্বৈতবাদ বা শাক্তপদ এবং স্বরূপ-অদ্বৈতবাদ বলা হইয়াছে এবং তিনি কলির বেদব্যাস আখ্যান লাভ করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রীশ্রীঠাকুরের সুদীর্ঘ সুগভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বহুবিদিত।

পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন-এর স্বরচিত কবিতা—

মা তোমা নিদয়া ব'লে কোন্ জন নিন্দা করে
তোমারই করুণামৃতে ভুবন জীবন ধরে।
মাতৃবক্ষে স্তন্য সিন্ধু তোমারি করুণা-বিন্দু,
অন্নপানে নেহারি-তোমারে।
তৃপ্তি-হেতু জল তুমি, বিশ্বধার তুমি ভূমি,
স্নেহে অঙ্ক ধর চরাচরে।
তনয়-শময়-ভয়নাশী অসি করে রয়,
বরাভয় দুই দক্ষ করে।
অসুরে করিতে মুক্ত, তার কর-শিরোরক্ত
ধর অঙ্গে, তার শ্রেয়ঃ তরে।
তাহে সেই ভাগ্যবান্, লভি দৈত্য দিব্যজ্ঞান
অনায়াসে যায় মোক্ষপুরে।।
ভীমকান্ততব আস্যে বিশ্বব্যাপী অট্টহাস্যে,
তা'তেও কৃপা-মাধুরী নিঝরে!
এমন করুণাময়ী কে আছে মা বিশ্বময়ী
তোমাসম ভুবন-ভিতরে।।

যুগে যুগে মানুষের বর প্রার্থনার বৈচিত্র্য

দেবপ্রসাদ মজুমদার

ভারতের সনাতন ধর্মসাধনার ধারা ও তার সূচনা প্রধানত বৈদিক যুগ থেকেই শুরু বলে মনে করা হয়। বৈদিক যুগ থেকেই আমরা নিরবিচ্ছিন্ন ধর্ম সাধনার একটা ইতিহাস ও ধারাবাহিকতা পেতে পারি, আর্যযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ধর্মশাস্ত্র সমূহ পাঠ করলে দেখা যায় যে বৈদিক যুগ থেকেই দেবতা তথা ভগবানের কাছে বর প্রার্থনার ব্যবস্থা ও ধারা চলে আসছে। বৈদিক যুগের বর প্রার্থনা, উপনিষদ যুগের বর প্রার্থনা, পুরাণের যুগের বা তৎপরে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে কি কি বর কি কি ভাবে প্রার্থনা করা হয়েছে তার ধরণ ও ধারাবাহিকতা কেমন তাহাই আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর আদিগ্রন্থ ঋক্‌বেদেও বর প্রার্থনা করা হয়েছিল। ঋগ্বেদীয় শান্তিবচনে আমরা পাই—'আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক, হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকট প্রকাশিত হও। হে বাক্য ও মন তোমরা আমার নিকট বেদার্থের আনয়নে সমর্থ হও, শ্রুত বিষয় যেন আমাকে ত্যাগ না করে। আমি মানসিক সত্য বলিষ্ঠ, বাচনিক সত্য বলিব, ব্রহ্ম আমায় রক্ষা করুন, ব্রহ্ম আচার্য্যকে রক্ষা করুন, শান্তি হউক এই প্রার্থনা।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়শান্তি বচনে বলা হয়েছে—'মিত্র আমাদিগের প্রতি সুখপ্রদ হউন, বরুণ সুখপ্রদ হউন, অর্যমা সুখকর হউন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আনন্দপ্রদ হউন। বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপনকারী বিষ্ণু আমাদিগের সুখদায়ক হউন।'

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শান্তি বচনে আবার বলা হয়েছে—'ব্রহ্ম আমাদের গুরুশিষ্য উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন, উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন, আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি, আমাদের উভয়ের লব্ধবিদ্যা সফল হউক, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।'

সামবেদীয় শান্তিবচনে বলা হয়েছে—'আমার অঙ্গসমূহ বাক্ প্রাণ চক্ষু শোত্র বল ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন, তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার নিত্য অবিচ্ছেদ হউক, শান্তি হউক।'

অথর্ববেদীয়শান্তি বচনে বলা হয়েছে—'হে দেবগণ, আমরা কর্ণে যেন কল্যাণকর বচন শ্রবণ করি। হে যজকীয় দেবগণ, আমরা চক্ষে যেন সুন্দর বস্তু দর্শন করি; দৃঢ়অঙ্গ প্রত্যঙ্গযুক্ত হইয়া আমরা যেন তোমাদের স্তবগানপূর্বক দেবকর্মে নিয়োজিত জীবনকাল প্রাপ্ত হই। বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন; সর্বজ্ঞানাধার পূষা আমাদের মঙ্গল করুন; সর্পাদিকৃত হিংসা-নিবারক গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন, বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন। শান্তি হউক।

চারটি বেদের চারটি বর প্রার্থনার নমুনা উদাহরণ দেওয়া গেল। এর দ্বারা বেদের যুগের বর প্রার্থনা সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই একটা ধারণা তৈরী হবে, এই প্রসঙ্গে বেদের কয়েকটি প্রধান সুক্তের বরপ্রার্থনার উদাহরণ দেওয়া হল। ঋক্‌বেদের ১।৯০।৬-৯ সূক্তটিকে মধুমতী সূচম্ বলা হয়। ঐ সূক্তে প্রার্থনা করা হয়েছে—'সৎ কর্ম পরায়ণ ব্যক্তির প্রতি বায়ুসমূহ যেন মধুর হয়; নদীসমূহ মধুময় রস ক্ষরণ করে; ওষধিসমূহ আমাদের নিকট মধুময় হউক।' আবার প্রার্থনা করা হয়েছে—'রাত্রি এবং দিবসসকল মধুময় হউক, পৃথিবী লোক মধুময় হউক, পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক আমাদের নিকট মধুময় হউক, অরণ্যাধিপতিদেব আমাদিগকে মিষ্ট ফল দান করুন; সূর্য আনন্দ প্রদায়ক হউন, গরুসকল আমাদিগের নিকট সুখপ্রদ হউন ইত্যাদি।

বিশ্বদেবসূক্তম্-এ (ঋগ্বেদ ১।৮৯) প্রার্থনা করা হয়েছে 'হে দেবগণ, যদবস্থায় তোমরা আমাদের শরীরে জরা আনয়ন কর এবং যদবস্থায় পুত্রগণ আমাদের রক্ষক হয়, তদবস্থাপন্ন আমাদিগের জন্য তোমাদিগের দ্বারা শত বৎসর

আয়ুই কল্পিত হইয়াছে। আমাদিগের কল্পিত আয়ু নিঃশেষিত হইবার পূর্বে মধ্যাবস্থায় তোমরা বিরূপ হইও না।

এছাড়া অসংখ্য বৈদিক সূক্তে ও স্বস্তিবচনে পরমেশ্বরের কাছে বহু কিছু প্রার্থনা করা হয়েছে, একস্থানে বলা হয়েছে—'হে পরমেশ্বর, আমাকে এরূপ দৃঢ় কর যেন সকল প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করে, আমিও যেন সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করি, আমরা যেন পরস্পরকে বন্ধুভাবে দর্শন করি। আমি জরাজীর্ণ হইলেও আমায় দৃঢ় করিও, আমি যেন তোমার দৃষ্টিভাজন হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকি; তোমার দৃষ্টির অধীনে যেন দীর্ঘজীবন যাপন করি।' আবার বলা হয়েছে—'যে যে দুশ্চরিত আমাদিগের নিকট হইতে দূর করা উচিত, তাহা তাহা হইতে আমাদের অভয় সম্পাদন করান, আমাদের সন্তানদিগের সুখ এবং আমাদিগের পশ্চাদিগের অভয় সম্পাদন করান। জল ও ওষধি সমূহ আমাদিঅেগর বন্ধু হউক ইত্যাদি।

আমরা জানি উপনিষদগুলিকে বেদান্ত বলা হয়, কারণ বৈদিক যুগের শেষে উপনিষদগুলির সৃষ্টি বলে পণ্ডিতগণ মনে করে। ঐ উপনিষদের যুগে যে সকল বর প্রার্থনা করা হয়েছে তা লক্ষ্য করানো এই সঙ্গে এখনও লক্ষ্যণীয় যে ঋক্‌বেদ ও অন্যান্য বেদের বর প্রার্থনার সঙ্গে এর প্রভেদ কত গভীর ও তাৎপর্য্য পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১।৩ মন্ত্রটি যেখানে বলা হয়েছে ঃ

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃতোর্মা অমৃতং গময়॥

অর্থাৎ অসৎ হইতে আমাকে সৎ-এ লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।

নটশোপনিষদ্‌ এ প্রার্থনা করা হয়েছে—সুবর্ণময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত আছে, হে পূষণ, সত্যধর্মা আমার উপলব্ধির জন্য তুমি উহা অপসারিত কর। আবার বলা হয়েছে—ইদানীং আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ু স্বরূপ সূত্রাত্মাতে মিলিত হউক, এই শরীর ভস্মীভূত হউক, হে ওম্‌ শব্দবাচ্য সঙ্কল্প স্বরূপ অগ্নি, তুমি আমাকে স্মরণ কর, হে অগ্নি, মহার্ঘ বস্তু লাভের জন্য আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও, হে দেব, সকল কর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তি তোমার জাত আছে—তুমি আমাদিগের নিকট হইতে কুটিল পাপ বিদূরিত কর।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ-এ বলা হয়েছে—'দেবগণের উৎপত্তিস্থল, ঐশ্বর্য বিধাতা এবং বিশ্বাধীশ যে মহা ঋষি হিরণ্যগর্ভকে জগৎ উৎপত্তির পুর্বে জন্ম দিয়েছিলেন, সেই রুদ্র আমাদিগকে শুভবুদ্ধি যুক্ত করান।'

হে রুদ্র, হে গিরিসন্ত, তোমার যাহা মঙ্গলময়, প্রসন্ন ও পাপবিনাবশক তনু, সেই সুখতম তনুর সহিত আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও।' লক্ষ্যণীয় বেদের বর প্রার্থনা ও উপনিষদের বর প্রার্থনার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এবং এই পার্থক্য যুগে যুগে কালে কালে ঘটে চলেছে। এটা কি সাধকের উপলব্ধির পার্থক্য, মনের পার্থক্য, ভক্তির পার্থক্য বা কালের পার্থক্য তা শুদ্ধজনেরাই বিচার করুন।

উপনিষদের যুগের পরেই শুরু হয়েছে পুরাণের যুগ। অষ্টাদশ পুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ—তারপর আছে রামায়ণ ও মহাভারত। এই পুরাণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মনে করা হয় বিষ্ণুপুরাণকে এবং সর্বশেষে পুরাণ মনে করা হয় শ্রীমদ্‌ ভাগবতকে। এই পুরাণগুলির প্রত্যেকটি অসংখ্য প্রার্থনার কাহিনী আছে এবং প্রত্যেকটি বর প্রার্থনার বৈচিত্র্যও ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা অবশ্যই সাধকের জ্ঞান, ভক্তি, উপলব্ধির নিরিখে বিচার্য।

সত্যযুগে ভগবান বিষ্ণু যখন হিরণ্যকশিপুকে বধ করবার নিমিত্ত নরসিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং হিরণ্যকশিপুকে বধ করবার পর ভক্ত প্রহ্লাদকে বর প্রার্থনা করতে বললেন তখন প্রহ্লাদ বলেছিলেন—

'নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্‌।
তেষু তেষ্বচ্যুত ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
(বিষ্ণুপুরাণ ১।১০।১৮)

অর্থাৎ বললেন হে নাথ, আমি যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, যেন তোমাতে আমার অনন্যা ভক্তি থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ্য যে, যে যেমন ব্যক্তি, যার যেমন জ্ঞান, বুদ্ধি, আচার বা তার বর চাইবার ধরণও ঠিক তেমনি। তাই দানবের আশীর্বাদ প্রার্থনা,

জ্ঞানীর বা ভগবৎ ভক্তের বর প্রার্থনা কখনোই একপ্রকার হতে পারে না এবং বাস্তবে তার প্রতিফলনও আমরা লক্ষ্য করে থাকি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীমুখে বলেছেন—চতুর্বিধা ভজন্তে মাম।' এই চারপ্রকার লোকেরা হলেন আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী, এখন স্বভাবতই এ প্রশ্ন এসে যায় ভগবান আর্তকে ত্রাণ করেন, তাই আর্তি তার আর্তত্ব দূর করবার জন্য রোগ, শোক, অশান্তি দূর করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে। আর অর্থ প্রার্থীরা অর্থের আকাঙ্খা করেই প্রার্থনা জানাবে। তবে জিজ্ঞাসুরা কি প্রার্থনা করবেন বা জ্ঞানীদের আকাঙ্খিত বর কি হবে তো বলা যায় না। তবে সাম্যবাদী তত্ত্বদর্শী আর্যঋষিরা যে জ্ঞানী ছিলেন সে সন্দেহ বোধকরি কেউ করবেন না। ঐ আর্যঋষিরা প্রার্থনা করেছেন ঃ

'সর্বে সুধীনো ভবন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ ভবেৎ॥'

অর্থাৎ—সবাই সুখী হউক, সকলেই নিরাময় থাকুক, কেউ যেন কোনভাবে দুঃখ বোধ না করে।

সাধারণ ভক্তরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। ঐ সকল পার্থিব দ্রব্য তাদের পার্থিব প্রয়োজনকে পূরণ করে, বিষয় লাভ করে বা লাভে সহায়ক হয়, এ হিসাবে ভক্তগণের সঙ্গে একটা বৈশ্যভাব বা লাভ প্রত্যাশী ব্যবসাদারের সম্পর্ক তৈরী হয়। কিন্তু সব ভক্ত তো জগতে সমান নয়, স্বাভাবিকভাবে মানুষ রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট দূর করবার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা এক অদ্ভুত প্রার্থনা লক্ষ্য করি যা অবশ্যই উল্লেখ্য।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ভগবানের আকাঙ্খিত মহাভারত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ধর্মের গ্লানি দূর হয়েছে, অধর্মের বিনাশ ঘটেছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছেন, পাণ্ডবদের সমস্ত বাধা প্রতিকূলতা দূর হয়েছে। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর ত্যাগ করে নিজ রাজধানী দ্বারকায় ফিরে যেতে চাইছেন। যাওয়ার পূর্বে সকলের কাছে বিদায় প্রার্থনা করে তাঁর পিসিমা কুন্তীদেবীর কাছে যখন এলেন তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে চিনি তুমিই পরব্রহ্ম, পদ্মনাভ, দেবকী মহাভাগ্যবতী—কারণ তিনি তোমাকে পুত্ররূপে পেয়েছেন, তাছাড়া বিপদের সময় তাঁর পতি বসুদেব তাঁর কাছেই ছিলেন। কিন্তু আমার বিপদে তুমি ছাড়া কেউ আমার কাছে ছিল না, আর এখন আমার সুখের সময় তুমি চলে যাবে তাই প্রার্থনা ঃ

'বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, আমাদের যেন সর্বদা এইরকম বিপদ হয় যাতে ভবভয় মোচনকারী তোমার দর্শন লাভ করতে পারি, ভাবুন কেমন প্রার্থনা, তিনি যে নিত্যই বিপদগ্রস্ত থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবন বহুস্থানে ভক্তজনকে ভগবান বরদানে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন এবং ভক্তগণ নিজনিজ ইচ্ছা, চেতনা, জ্ঞান, প্রারব্ধ, ভক্তি, শ্রদ্ধা অনুসারে বিভিন্ন প্রার্থনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের একান্ন অধ্যায়ের ৫৫নং শ্লোকে আমরা দেখি, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুচকন্দকে বর প্রদানে ইচ্ছুক—তখন তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ

'ন কাময়েহন্যং তব পাদসেবনাদ কিঞ্চন প্রার্থতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হবাগর্বদং হরে বৃনীত অর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্।।

অর্থাৎ হে প্রভো! আপনার পদসেবা নিরভিলাষ অকিঞ্চন জনেরা প্রার্থনা করেন, সেই পদসেবা ভিন্ন অন্য কিছুই আমি কামনা করি না, হে হরি! অপবর্গদাতা আপনার আরাধনা করিয়া কোন আর্য্য ব্যক্তি নিজের বন্ধন যাহাতে হয়, তাদৃশ বর প্রার্থনা করে না। ভাবুন কেমন ও কি প্রার্থনা ভক্ত মুচকন্দের।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দের নাম অধ্যায়ে আমরা দেখি যখন পরসখা ভগবান নারায়ণ ভৃগুবংশোদ্ভব মার্কণ্ডেয়ের তপস্যায় তৃপ্ত হয়ে বর প্রদান করতে চাইলে মার্কণ্ডেয় অন্য প্রার্থনা না করে বললেন ঃ

জিতং তে দেবদেবেশ প্রপন্নত্তির্হরাচ্যুত।
বরৈণৈতাবতালং নো যদ্ভবান্ সমদৃশ্যত॥

'হে প্রপন্নার্ত্তিহরে! হে দেবদেব! হে অচ্যুত! আপনিই জিতিয়াছেন, আমার বরে প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমি আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি। প্রাকৃত ব্যক্তিরাও যাঁহার পাদপদ্ম যোগে পরিপক্ক মনের দ্বারা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাদি হইয়া থাকেন, অথবা যোগপক্ক মনের দ্বারা আপনার

পাদপদ্মকে গ্রহণ করিয়া ধ্যানবলেই দর্শন করেন, সেই আপনি নয়নগোচর, অতএব আমার আর বরের প্রয়োজন কি?

ঐ শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের দশম অধ্যায়েই আমরা পাই যখন তপস্যায় তুষ্ট মহাদেব প্রসন্ন হয়ে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে বর প্রার্থনা করতে বললেন—তখন তিনি প্রার্থনা করলেন—

'কং বৃনে নু পরং ভূমন্ বরং ত্বদ্বরদর্শনাৎ।
যদ্দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সত্যকামঃ পুমান্ ভবেৎ॥
বরমেকং বৃনেথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষনাৎ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি॥

অর্থাৎ 'হে ভূমন্! শ্রেষ্ঠদর্শন আপনার নিকট এই সাক্ষাৎকারের পর আর কি বর প্রার্থনা করিব, যাঁহাকে দর্শন করিলে মানব পূর্ণকাম অর্থাৎ সকলানন্দ সমূহ স্বরূপ সত্যকাম অর্থাৎ যথেচ্ছু হইয়া থাকে। তথাপি পূর্ণকামাভিবর্ষী হইতে একটি বর প্রার্থনা করি। ভগবানে ও তদ্‌ভক্তবৃন্দে ও আপনাতে যেন অচলা ভক্তি থাকে।' লক্ষ্যকরান ঋষি মার্কণ্ডেয়ের বর প্রার্থনা।

এবার অন্য পুরাণ থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। স্কন্দ পুরাণে দ্বারকা মাহাত্ম্যে (২।১৮) আমরা দেখতে পাই মহর্ষি বশিষ্ঠ যখন অর্ব্বুদকে বরদান করতে চাইছেন অর্ব্বুদ বলছেন—আপনি যে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এটা আমার কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ, আমার অন্য কোন বরের প্রয়োজন নেই।

'এষ এব বরোহ স্মাকং যত্ত্বং তুষ্টো মহামুনে।'

ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ যখন ভগবান শঙ্করের কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন, তখন বলেছিলেন আমরা নারদ পঞ্চরাত্রে পাই

'দেহি মে হরিভক্তিঞ্চ তন্নামসেবনে রুচিঃ।
অতি তৃষ্ণা গুনাখ্যানে নিত্যমন্ত্র মমেশ্বর॥

অর্থাৎ হে শঙ্কর ভগবান—আপনি আমাকে হরি ভক্তি দান করুন। আর তাঁর শ্রীনামে যেন আমার রুচি হয়, নিত্য যেন তাঁর গুণকীর্তন করতে পারি।

ভাবুন নারদের কেমন প্রার্থনা কেমন আকাংখা, এখানে অবশ্যই উল্লেখ একটা একান্ত ভক্তের প্রার্থনা। মহাভারতে এ বহুস্থানে বরপ্রদানের কাহিনী আছে। ঐ সকল বর প্রার্থনা ও বরপ্রদান সকাম ও নিষ্কাম উভয়ই এবং যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মহাভারতের বনপর্বে আমরা দেখতে পাই এসময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মের নিকট বর প্রার্থনা কালে বলেছিলেন যে তিনি যেন সতত লোভ ক্রোধ প্রভৃতিকে জয় করতে পারেন। আর দান, ধ্যান, তপস্যা এ সত্যে তাঁর নিত্য মতি থাকে। ঐ মহাভারতের বনপর্বে আমরা দেখতে পাই ভগবান যখন উত্তঙ্ককে বরদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তখন তিনি বলছেন—

'পর্য্যাপ্তে মে বরো হ্যোষ যদহং দৃষ্টবান হরিম্।'

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে আমরা দেখতে পাই একসময় শ্রীকৃষ্ণ তপস্যা দ্বার মহাদেবকে তুষ্ট করেছেন, মহাদেব যখন তাঁর নিকট আবির্ভূত হলেন তিনি তাঁর কাছে অর্থ, যশ, সুখ, রাজত্ব প্রার্থনা না করে শুধু অচলাভক্তিই প্রার্থনা করেছিলেন। এই উদাহরণ অবশ্যই ভগবানের লোকশিক্ষার জন্য সন্দেহ নেই।

এছাড়া সৌরপুরাণে, ঘিল হরিবংশে, নারদ পঞ্চরাত্রে, শিবপুরাণে, দেবীপুরাণে, বরাহপুরাণে, এককথায় অষ্টাদশ পুরাণে, অষ্টাদশ উপপুরাণে প্রায় সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থে বর প্রার্থনা ও বরদানের কাহিনী বিদ্যমান, আর একটাও লক্ষ্যণীয় যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর প্রার্থী ও বরদানকারী দেবতার মধ্যে অসংগতিহীন বর অনায়াসেই লক্ষ্য, অপরদিকে জগতের অকল্যাণের জন্য অসুর, রাক্ষস প্রভৃতিরা যে বর প্রার্থনা করেছেন তা বরদাতা অনেকাংশে দান করতে অস্বীকার করেছেন। এই প্রসাদ মনে রাখা উচিত আসুরিক ভাবনা জগতের অকল্যাণের জন্য।

এবার শ্রীশ্রীচণ্ডীর উদাহরণে আসা যাক, বৈদিক বিচারে ও কালের বিচারে শ্রীশ্রীচণ্ডী অনেক পরের রচনা, এটাকে খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচনা বলে পণ্ডিতেরা মনে করে থাকেন, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর প্রার্থনা ভারী অদ্ভুত। এখানে সবই মনে হয় সকাম কামনা, বলা হয়েছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি—রূপ, জয়, যশ দাও নাশ মা শত্রুরে, এছাড়া সবেতেই দাও দাও, কোন কিছু বাদ নেই, আশ্চর্য বলা হয়েছে—ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্' মনোরম স্ত্রী দাও, ভাল

কথা কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীর ঋষি বোধকরি স্ত্রীদের নিয়ে বিব্রত ছিলেন—তাই আকাংখা করেছেন মনোবৃত্তানুসারী স্ত্রী হোক, এমন অসংখ্য কামনা আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখতে পাই, এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে বৈদিক ভাবনায় বর প্রার্থনা বা পূর্বের উল্লিখিত পুরাণ বা ভাগবতের বর প্রার্থনার সঙ্গে শ্রীশ্রীচণ্ডীর বর প্রার্থনা সম্পূর্ণ বিপরীত।

আগেই বলা হয়েছে পূজা দুপ্রকার সকাম ও নিষ্কাম। তাই ফলপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সকাম অর্থাৎ পার্থিব ও নিষ্কাম অপার্থিব ফললাভ হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেই আমরা দেখি রাজা সুরথ ও সমধি বৈশ্য উভয়েই মহামায়া দুর্গার অর্চনা ও আরাধনা করলেন। কিন্তু আকাংখা অনুযায়ী মহারাজা সুরথ তাঁর হৃত রাজ্য লাভ করলেন আর সমধি বৈশ্য লাভ করলেন মোক্ষ।

পূজার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শ্রীগণেশের পূজা করবার বিধি আছে, গণেশকে সিদ্ধিদাতা ও লাভ দানকারী বলে প্রার্থনা করা হয়, এছাড়া বিঘ্ননাশ করং দেবং বলেও বিঘ্ননাশের বর প্রার্থনা করা হয়।

শ্রীসূর্যের ধ্যানমন্ত্রে কশ্যপ তনয় সূর্যদেবকে সর্বপাপ হরণের প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীনারায়ণের কাছেও রক্ষার প্রার্থনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর শিব বা মহাদেবের কাছে সকল কামনা ও প্রার্থনা পূরণের প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। জয়দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে ও প্রার্থনায় বলা হয়েছে—হে দেবী, আপনি আমায় দীর্ঘজীবন দান করুন, বিদ্যাদান করুন, ধন সম্পদ দান করুন, ও সর্বপ্রকার ঐহিক সুখে সুখী করুন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর কাছে ধন প্রার্থনা এবং সরস্বতীর কাছে বিদ্যাং দেহি বলে প্রার্থনা জানানো হয়। এছাড়া অসংখ্য দেবদেবীর ধ্যানমন্ত্রে প্রণামমন্ত্রে বিভিন্ন বর প্রার্থনার উল্লেখ আছে।

আধুনিককালে বস্তুতান্ত্রিক যুগে ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ও এক একজন সাধক, ভক্ত এমন এমন প্রার্থনা করেছেন যা অবশ্যই উল্লেখ্য, যেমন ভক্ত সাধিকা মীরাবাই রাজরানী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ইষ্টদেবের সঙ্গে দুঃখকে বরণ করবার প্রার্থনা জানিয়েছেন। বলেছেন—দুখ জহাঁ তহাঁ পীর—যেখানে দুঃখ সেখানেই ভগবান।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাড়ীতে নানা অসুবিধা অভাব অভিযোগ, দুঃখকষ্ট চলছে, অন্ন জুটছে না, তিনি নিজগুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিকারের জন্য মাকালী ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করতে বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—তিনি যেন নিজে গিয়ে তাঁর যা আকাংখা তা মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নেন, গুরু রামকৃষ্ণের আদেশে নরেন্দ্রনাথ একবার নয় তিন-তিনবার যান কিন্তু মায়ের কাছে অন্ন, বস্ত্র, ধন, দৌলতের পরিবর্তে ভক্তি, শ্রদ্ধা, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রার্থনা করেন।

এছাড়া হালিশহরের রামপ্রসাদ সেন, ঠাকুর সর্বানন্দ, কালীসাধক রামকৃষ্ণ, জয়দেব, অর্জুন মিশ্র, অসংখ্য বৈষ্ণব সাধক, দক্ষিণ ভারতের আড়বারশ এবং অসংখ্য ভক্ত ভগবানের দর্শনেরই শুধু আকাংখী, তাঁরা শুধুই ভগবানের দর্শন প্রার্থী অন্য কিছু তাঁর থেকে কামনা করেন নি, অবশেষে শ্রীগীতায় অর্জুনের আকাংখার সঙ্গে জুড়ে প্রার্থনা জানাই—

'কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥'

১১।৪৬

কিরীটি ধারা এবং গদা ও চক্রহস্ত তোমার সেই পূর্বরূপই আমি দেখতে ইচ্ছা করি, হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্তে, তুমি চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ কর।'

শ্রীনামপ্রচার পরিক্রমায় সর্বাধীশ কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজজী তথা ১২৩তম ওঙ্কারপঞ্চমী মহোৎসব ঃ মুম্বই, পুণা, হায়দ্রাবাদ

নিবেদক ঃ কিঙ্কর দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, মহাসচিব, ওঙ্কারনাথ মিশন

সংক্ষিপ্ত সংঘ সমাচার

বহুদিন থেকেই মুম্বই-এর ভক্তেরা সর্বাধীশজীকে বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও দুটি মহানগরী পুণা এবং হায়দ্রাবাদের ঐকান্তিক আহ্বান। এইবারকার আহ্বান ছিল বড়ই মাধুর্য্যমণ্ডিত, কারণ তিনটি স্থানের ভক্তরাই যথাশক্তি উপচারে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি মহোৎসবরূপে পালন করতে আগ্রহী হয়েছেন। মুম্বই-এর অনুষ্ঠান বিষয়ে স্থানীয় বিশিষ্ট উদ্যোক্তা সমীরকুমার 'পথের আলো'র পূর্ব সংখ্যায় কিছু বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তবুও সংক্ষেপে বলা দরকার—যুগপৎ নবীন ও প্রবীণদের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান ছিল অভূতপূর্ব। সর্বাধীশজীর বাছাই সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন ওঙ্কারনাথ মিশনের সর্ব ভারতীয় সহ-সভাপতি শ্রী সমীরণ মুখোপাধ্যায়, মহাসচিব শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, নিত্যসেবক উত্তমভাই, উত্তম নামকারী রবিভাই (আরমি বিভাগ), তবলাবাদক ভক্তপ্রবর তিমিরবরণ এবং সুপাচক সান্যালদা। স্থানীয় প্রবীণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে সমীরভাই, শিবানী পানোয়ার, লোপামুদ্রা রায়, সপুত্র নীতাদিদি প্রভৃতি। বিশিষ্ট উপস্থিতির মধ্যে বাসুদেব সাক্সেরিয়া, পদ্মামা, কাশীনাথ তাপুরিয়া, অধ্যাপিকা সুমন রাও, অধ্যাপিকা কল্পনা বোরা, কলকাতা হতে আগত ভক্তদম্পতি অরুণ রায় ও শ্রীমতী কেয়া রায় প্রভৃতি। অনুষ্ঠান হয় জুহুর চারবাংলো অঞ্চলে, খাদি প্রতিষ্ঠানের একটা ভাড়া বাড়ীতে, অভিষেক ব্লক 'বি'তে। ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন খাদির ডিরেক্টর সমীর কুমার। শ্রীমান্ রবিভাই, স্থানীয় ভক্ত সুমন রাও, তবলাবাদক তিমিরবরণ, কখনও কখনও সর্বাধীশজী নামকীর্তনে সভামঞ্চ প্রায়ই নামময়, প্রেমময় ও সীতারামময় রেখেছিলেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার (২০১৪) অনুষ্ঠান ছিল বৈচিত্র্যময়। সকাল হতে নামকীর্তন তো চলমান ছিলই। ১১টা নাগাদ সভাস্থল বহুভক্তে পরিপূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সভামঞ্চও আলোকিত। অর্ধশতাব্দী পরে ওঙ্কারনাথ মিশন কর্তৃক পুনঃ প্রকাশিত শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ইংরাজী জীবনীগ্রন্থ আচার্য্য ভূমানন্দদেব রচিত OUR MASTER এর সুন্দর ভূমিকাটি পর্য্যায়ক্রমে পাঠ করে শোনান অধ্যাপিকা সুমন রাও আর ইংরাজী ও হিন্দীতে সকলের উপযোগী ক'রে যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা করতে থাকেন সর্বাধীশজী। সম্ভ্রান্ত ভক্তমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তা শুনতে থাকেন। সান্ধ্যসভায় অধ্যাত্ম জগতের নানাবিধ দুরূহ প্রশ্নের সর্বাধীশজী কর্তৃক যথোচিত প্রত্যুত্তরে সভাস্থল জমজমাট হ'য়ে যায়। আলোচনার বিষয় ছিল নাদ, জ্যোতি, বিন্দু, আকাশ, গ্রন্থীত্রয়, ষট্‌চক্র, কুণ্ডলিনী জাগরণ ও বিভিন্ন চক্রভেদ করে সহস্রারে শিবশক্তির মহামিলন তথা সমাধি। উজ্জয়িনী কালিদাস একাডেমির বহু বিশিষ্ট প্রাক্তন ডিরেক্টর অধ্যাপক ডাঃ কৃষ্ণকান্ত চতুর্বেদী এবং তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী বিদুষী অধ্যাপিকা ডাঃ চন্দ্রাদেবী মাত্র কিছুক্ষণের জন্য (অসুস্থ শরীরের কারণে) সভায় থাকবেন এই সংকল্প নিয়ে এলেও সর্বাধীশজী দুর্লভ অধ্যাত্ম বিষয়ের বর্ণন ও বিশ্লেষণে শেষ পর্যন্ত দেড়

ঘণ্টাধিককাল সভায় থেকে যেতে তাঁরা বাধ্য হন। অনেক বিদুষী মহিলা সাধিকা একান্ত আগ্রহ সহকারে নিজ নিজ ডায়রীতে প্রয়োজনীয় Notes নিতে থাকেন এবং মাঝেমধ্যে সঙ্গত প্রশ্নবানে মহারাজজীকে বিদ্ধ করতে থাকেন। উত্তরদানে সিদ্ধ মহারাজজী সকলেরই অন্তর নবারুণালোকে উদ্ভাসিত করে দেন। পরদিবস অর্থাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারী সকালে স্থানীয় বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা অধ্যাপক ডাঃ অতীশ চট্টোপাধ্যায় মুম্বই এর এক বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী পণ্ডিত ধ্রুব ঘোষকে নিয়ে আসেন। তিনি দরদীকণ্ঠে তিনটি ভজনগানে এক অপূর্ব সুরলোক সৃষ্টি করেন। সর্বাধীশজীও তাঁর ভাববিমণ্ডিত কণ্ঠে শ্রীমান্ চন্দনভাই রচিত বহু প্রশংসিত 'এসেছে এক আজব ভিখারী' গানটি গেয়ে শোনান এবং ইংরাজী ও হিন্দীতে তার সুমধুর ব্যাখ্যা করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে তথা উপস্থিত বহুমান্য শিল্পীকে চমৎকৃত করে দেন। এই ভজনানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই মুম্বই এর বহু প্রতীক্ষিত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ভক্তিধনে মহাধনী ভক্তরাজ শশাঙ্ক আন্ট্‌লে ভাই পুণা থেকে এসে গিয়েছেন দুটি গাড়ী নিয়ে সসঙ্গী মহারাজজীকে নিয়ে যাবেন তাঁর স্বস্থান পুণায়—পরবর্তী দুটি দিন ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী পুণার অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। বিকালে যাত্রাকালে মুম্বই-এর ভক্তবৃন্দের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হৃদয় ভারাক্রান্ত। নয়ন অশ্রুসজল। প্রায় তিনদিন নিজনিজ সংসার তথা কর্মস্থলের কথা ভুলে বেশীদিন সময় এই অভিষেকের সভাগৃহেই তাঁরা পরমানন্দে বন্দী ছিলেন। আজ সেই মহামিলন-মেলা ভাঙ্গল। তবে নীতাদিদি তাঁর নিজের গাড়ী ও সপুত্র সারথিকে নিয়ে পুণা ছুটে চললেন মহারাজজীকে পৌঁছে দিতে।

পুণার শশাঙ্ক নিবাস ফুলে ফুলে, মালায় মালায় অতি মূল্যবান আলপনায় ও আলোকসজ্জায় যেন বিরাট উৎসব বাড়ীর রূপ নিয়েছে। পৌঁছাবামাত্র উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির সঙ্গে মহারাজজীর সহ ভক্তগণকে সাদর অভ্যর্থনা। মহারাজজীকে বাড়ীর একটি সুসজ্জিত ঘরে, বাকি সঙ্গীদের একটি পাশের Guest House এ থাকবার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী একটু বেলা হতেই শাস্ত্রীয় নিয়মে সুপণ্ডিত পূজারীর দ্বারা শ্রীগুরুপাদপূজনের বিরাট ব্যবস্থা। মহারাজজী শ্রীরামায়ণের শ্রীভরতজীর মহান্ আদর্শেই অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিজ পাদপূজনের পরিবর্তে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই বহুপূজিত পাদুকারই পূজা করান পূজারীজীও সপরিবার শশাঙ্কভাইদের দিয়ে। নিজেও সেই মহাপূজায় অংশগ্রহণ করেন। পূজান্তে স্বলিখিত ইংরাজী 'Be Tension Free' হ'তে সেই অংশটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে থাকেন যে অংশটিতে ভরতজীর শ্রীরাজপাদুকা পূজনের কথা আছে। ভরতজী শ্রীরামের পাদুকা পূজায় দেশবাসীকে উৎসাহিত তথা অনুপ্রাণিত করে বলছেন ঃ

ছত্রং ধারয়ত ক্ষিপ্রং আয্যাপদাবিমো মতৌ।
আভ্যাং রাজো স্থিতো ধর্মঃ পাদুকাভ্যাং গুরোর্মম॥

অর্থাৎ যথাশীঘ্র শ্রীরামের শ্রীপদযুগল সদৃশ এই পাদুকাদ্বয়ের উপর ছত্র ধারণ কর। কারণ এই পাদুকাযুগলই হল আমার শ্রীগুরুস্বরূপ। এদের ওপরই আমাদের রাজ্যের ধর্ম ন্যস্ত আছে। পাদুকাপূজার এই পরমলগ্নে শ্রীরামায়ণের ভরতজীর গুরুভক্তির উল্লেখ যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি মধুর। শ্রীরামপাদুকাযুগলের ওপর শ্রীভরতজীর এই অনুপম নির্ভরতাকেই মহারাজজী সকলকে আদর্শ করতে বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ পাদুকারই পূজা করতে নির্দেশ দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকাযুগল বড় ভক্তিভরে শশাঙ্কজীর আনীত মহারাজজীর জন্য পাদুকাদুটিতে স্পর্শ করিয়ে দিয়ে তাকে তিনি নির্দেশ দিলেন—আজ হতে এই দুটিই হল তোমার শ্রীগুরুপাদুকা। এই পাদুকাযুগলকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করো, নিত্যপূজা কর। তার দ্বারাই তোমার সর্বার্থ সিদ্ধি হবে।...

সন্ধ্যাকালে স্বপ্নপূর্তি নামক এক সুদৃশ সভাকক্ষে এক মনোরম ধর্মসভা আহূত হয়। নামে গানে প্রবচনে ধর্মসভা আনন্দে উদ্বেল হয়। আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল—মানব জীবনের চরমপরম লক্ষ্য পরমানন্দ প্রাপ্তির উপায় কি। সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে যুগাবতার

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাজীবনী ও বাণী বিষয়েও মহারাজজী বিশেষ আলোকপাত করেন। ইংরাজী ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই তিনি প্রবচন দান করেন সকলের বোঝবার সুবিধার জন্য। প্রায় তিন শতাধিক আগ্রহী শ্রোতায় সভাগৃহ পূর্ণ ছিল। প্রবচন ভজন চলাকালীন প্রত্যেক শ্রোতাই ছিল একাগ্র চিত্ত। সভান্তে শশাঙ্কভাই সমগ্র ভক্তমণ্ডলীকেই উত্তম এবং আকণ্ঠ প্রসাদদানে পরিতৃপ্ত করেন।

পরদিন অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারী সকলে হায়দ্রাবাদ মুখী হয়। হায়দ্রাবাদের প্রবীন উদ্যোক্তা Aizant Company-র এক ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ তথাগত দত্ত, আর এক বিজ্ঞানী ডঃ অভিষেক চক্রবর্তী ও তদীয় ধর্মপত্নী শ্রীমতী অমৃতা চক্রবর্তী। তৃতীয় এক স্থানীয় তেলেগু গুরুভ্রাতা শ্রী কিশোর রাও এর একক উদ্যোগিত প্রশংসনীয়। তথাগতভাই এর নিবাস জাভিমেলটা ভিলেজের স্যাটেলাইট টাউনশিপে, ডঃ চক্রবর্তীর নিবাস। এবং কিশোরভাই ইদানীং হৃষীকেশবাসী হলেও তার পৈত্রিক নিবাস হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত Film Stars দের area jubilee Hills এ। এই তিনটি জায়গাতেই অনুষ্ঠান হয়।

১২ই ফেব্রুয়ারী প্রস্তুতিপর্ব। Satelite Township এ তথাগতভাই ও তার ভক্তিমতী মাতৃদেবীর স্নেহযত্নেই দিন কাটে। পরদিন সকালেই অভিষেক ভাইয়ের বাড়ীতে ধর্মপ্রচার পর্ব শুরু হয় অপূর্ব নামকীর্তনের মধ্য দিয়ে। রবিভাই তার সুললিত রাগসিদ্ধি কণ্ঠে সকলকে মোহিত করে দেয়। তারপর সর্বাধীশজী হঠাৎ এক নূতন রাগে নামকীর্তন করে সকলকে চমৎকৃত করে দেন। বলাবাহুল্য নামকীর্তনে অনেকেই যোগদান করে। অভিষেকভাই এর শ্বশুর হলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিস্টিকসের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ রাজেন পণ্ডা। তিনিই সস্ত্রীক এই ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জামাতাগৃহে উপস্থিত হয়েছেন এবং নানাভাবে সহযোগিতা করছেন। নামকীর্তনেও কণ্ঠ মেলাচ্ছেন। বলাবাহুল্য তিমিরবরণ ভাই-এর তবলা বাদনে নৈপুণ্য সর্বত্রই নামকীর্তনে এক অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করছে। প্রসাদ পরিবেশনে মাতৃদেবীসহ স্নেহময়ী অমৃতাদিদি সত্যই অমৃত সিঞ্চন করছেন। তাঁরই উদ্যোগে স্থানীয় একটি সভাগৃহে সন্ধ্যায় সহজক্রিয়া যোগ অর্থাৎ SKY এর অনুষ্ঠান শতাধিক ব্যক্তির সাগ্রহ যোগদানে জমজমাট হয়। Demonstration দেন দেবীপ্রসাদজী। কখনও স্বয়ং মহারাজজী। অধিকাংশ ব্যক্তিই সাধ্যমত যোগপদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকেন। যোগ ব্যাখ্যাকালে মহারাজজী খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে যোগিরাজাধিরাজ অনন্তশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথদেবের সর্বতোমুখী অধ্যাত্মরাজ্যের কথা আলোচনা করেন এবং সবশেষে নামকীর্তনের দ্বারা সকলকে যুগধর্ম নামমুখী করে দেন।

হায়দ্রাবাদের দ্বিতীয়দিনের (১৪ই ফেব্রুয়ারী) অনুষ্ঠান তথাগত ভাইয়ের সার্বিক পরিচালনাতেই সুসম্পন্ন হয়। তার Satelite Township এর বাসভবনেই নামকীর্তন ও দীক্ষাদান। বিকালে স্থানীয় বিখ্যাত বালাজীর মন্দির দর্শনে যাওয়া হয়। বাইরের তেমন ঐশ্বর্য্য না থাকলেও বালাজীর মন্দির আন্তর ঐশ্বর্য্যে তথা ভক্ত সমাগমে অতি গৌরবময়। ক্রমাগত শতশত নরনারী ব্যাকুলভাবে 'গোবিন্দা' কীর্তন করতে করতে ভক্তিভরে মন্দির পরিক্রমা করছে অন্ততঃপক্ষে এগারোবার। কারাও বা যথাশক্তি অনেক বেশীবার। আমরা করতাল বাজিয়ে প্রভুদত্ত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতেই ১১বার মন্দির পরিক্রমা করলাম। এরমধ্যে ভক্তপ্রবর কিশোর রাওভাই উপস্থিত হয়ে তারই গাড়িতে আমাদের অনুপম প্রাকৃতিক শোভাযুক্ত Film area Jubilee Hills এ তাদের প্রাসাদোপম পৈত্রিক নিবাসে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের তেলেগু দেশীয় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রায় শতাধিক ভক্তে গৃহস্থল পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আর যেখানে প্রভু সীতারামের অনুষ্ঠান সেখানেই প্রথম ও প্রধান উপচার তো হরিনাম সংকীর্তন। সুতরাং রবিভাই সসঙ্গী নামানন্দে প্রেমানন্দে সহজেই সমবেত ভক্তমণ্ডলীর হৃদয় জয় করে নিল। ভাষা বা আভিজাত্যের ব্যবধান নামমহিমাতেই বিদূরিত হয়ে গেল। সকলেই কিছুক্ষণের মধ্যে নামময় তথা

সীতারামময় হয়ে গেলেন। এরপর প্রশ্নোত্তরের (Question and Answers class) সর্বাধীশজী উত্তমরূপেই পরিচালনা করলেন। আগ্রহী ভক্তগণ নিজনিজ প্রশ্নের সদুত্তর পেয়ে যেন অনেকটাই নিশ্চিন্ত হলেন। মহারাজজীর মূল বক্তব্য ছিল একমাত্র ঈশ্বরে শরণাগতি লাভের দ্বারাই নামাশ্রয়ের দ্বারাই জীবনের সকল সমস্যারই সমাধান হতে পারে, জীবনের অনিবার্য্য দুঃখকষ্টের মধ্যেও আনন্দময় ও নির্ভয় নিশ্চিন্ত হতে পারে।

সুশিক্ষিত যুবকভক্ত কিশোর রাও-এর অনুপ্রেরণায় সর্বোপরি শ্রীভগবান ওঙ্কারনাথদেবের অমৃত প্রভাবে ৩৫।৪০জন তেলেগু ভক্ত এইদিন সর্বাধীশজীর মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে দীক্ষাশ্রয় লাভ করে চিরনিশ্চিন্ত হয়।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান শ্রীমান্ তথাগতভাই এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী হায়দ্রাবাদের সৈনিকপুরী কালীবাড়ীতে বিরাট অনুষ্ঠান। ১২টা নাগাদ সভা শুরু হয়। নামকীর্তন, ভজন, শেষে ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই ভাষণ। কালীবাড়ীর চারপাশে বহু বাঙালীর বাস তাই বাংলাতে বলবার জন্যও অনুরোধ আসে। সর্বশেষে সংক্ষিপ্তাকারে সহজ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান। ধর্মসভাকালে ১৫০।২০০ ভক্ত সমাগম—প্রসাদ গ্রহণকালে সর্বত্র একই দৃশ্য—৪০০।৫০০ ভক্তের জন্য প্রসাদের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছিলেন তথাগতভাই। সুতরাং শুধু অতিথি অভ্যাগতই নয়, নরনারায়ণ সেবাও চলতে থাকে অকাতরে। এইভাবে অকাতর নামদান, প্রেমদান ও অন্নদানের মাধ্যমে শ্রীভগবান ওঙ্কারনাথদেব কেন্দ্রিক হায়দ্রাবাদের প্রথম ধর্মীয় অনুষ্ঠান তথা ১২৩তম জন্মতিথি মহোৎসব সাড়ম্বরেই প্রতিপালিত হয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

*কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই সর্বস্তরে অনেক ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় এবং পত্রিকার মান উন্নয়নের সংকল্পের প্রেক্ষায় আমরা আগামী বৈশাখ ১৪২১ সংখ্যা থেকে **'পথের আলো'** বার্ষিক উপায়ন ১৫০ (দেড়শত) টাকা ধার্য্য করতে বাধ্য হচ্ছি। পাঠক ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য, ভক্ত, অনুরাগীগণের প্রতি নিবেদন এই যে, অনুগ্রহ করে বাস্তব অসুবিধা বিবেচনা করে এই উপায়ন বৃদ্ধিটুকু স্বীকার করবেন।*

*এই প্রসঙ্গে আনন্দের সঙ্গে জানাই—**'জয়গুরু'** পত্রিকা সংরক্ষণকল্পে আগামী বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'পথের আলো'তে সংযুক্ত হবে 'জয়গুরু'। একটি মলাটে দু'টি ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন সাধন উপাচারে সমৃদ্ধ দু'টি পত্রিকা একত্রে নিবেদিত হবে এবং পত্রিকায় আরও চিত্র সংযোজনের চেষ্টাও আমাদের থাকবে। শুধু আপনাদের সমর্থন ও সহানুভূতি চাই। সর্বোপরি সহযোগিতা চাই। লেখা পাঠাবেন, পরামর্শও দেবেন।*

বিনীত-
সম্পাদক

শ্রীশ্রীঠাকুরের ১২৩তম আবির্ভাব মহোৎসব ঃ সংঘের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় মহামিলন মঠে ২০, ২১, ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

নিবেদক ঃ শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-মঠাধ্যক্ষ, মহামিলন মঠ

শ্রীশ্রীঠাকুরের ১২৩তম আবির্ভাব মহোৎসব ভারতের বিভিন্ন স্থানে সমারোহের সঙ্গেই পালিত হয়েছে বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ বৃহস্পতিবার। কিন্তু বরাবরের মত সংঘের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় মহামিলন মঠে সঙ্গত কারণেই এই মহোৎসব নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনদিনব্যাপী মহাসমারোহের সঙ্গেই প্রতিপালিত হয়েছে বিগত ২০, ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী। অন্যান্যবারের মত এইবারও সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ সুরম্য শ্রীগুরুমন্দিরে ২০শে ফেব্রুয়ারী আবির্ভাবলগ্নে সাড়ম্বরে শ্রীগুরুপূজা পুষ্পাঞ্জলি ও বিশেষ হোমপর্ব সমাপন করেন। তাঁকে সহায়তা করেন মহামিলন মঠাধ্যক্ষ পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ বেদতীর্থ। পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের উদ্দেশ্যে বহু ভক্তের সমাগমে 'জয়গুরু' হর্ষধ্বনিতে শ্রীগুরুমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন পরিপূরিত হয়ে যায়। এ দুর্লভ মুহূর্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের জন্য দলে দলে ভক্তগণ শ্রীগুরুমন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। অপরপক্ষে আর এক প্রান্ত সীতারাম ভবনের দ্বিতল সভাগৃহের দিকে দলে দলে দীক্ষার্থী ভক্তগণ অগ্রসর হতে থাকেন পুণ্যলগ্নে পুণ্যতীর্থে শ্রীভগবান ওঙ্কারনাথদেবের অভয় অমৃত শ্রীচরণকমলে চিরাশ্রয়লাভের উদ্দেশ্যে। প্রভুর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্বরূপ সংঘ সর্বাধীশ কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজ আজ সকলকে দীক্ষাদান করবেন। সীতারাম ভবনের হল পরিপূর্ণ। বলাবাহুল্য একবারে দীক্ষাকার্য সমাধা করা অসম্ভব তাই দু-তিন বারে সর্বাধীশজীকে এই মহান কার্য্য সুসম্পন্ন করতে হল। দিতে হল সময়োপযোগী দীক্ষান্ত ভাষণ।

এরইমধ্যে মহামিলন মঠের মূল মন্দির শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর শ্যামরাণীর মন্দির তথা শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামন্দিরও অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে। একদিকে পূজায় ব্রতী আছেন শ্রীমান্ সুদীপভাই ও শ্রীমান্ সুদর্শনভাই, অপরদিকে একনিষ্ঠভাবে দীর্ঘকাল সেবায় নিযুক্ত আছেন শ্রীযুক্ত আনন্দময়দা। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপটিতে ভক্ত সমাগমে উত্তাল আছে, কারণ এই পুণ্যক্ষেত্রেই নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান দর্শনীয়। যথাকালে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা গান করলেন সংঘের উপস্থিত শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধক কিংকর বিপুলানন্দজী মহারাজ। অবশ্য এইবার মহোৎসবের আর একটি বড় আকর্ষণ সীতারামভবনের সামনের যজ্ঞমণ্ডপে লঘু-বিষ্ণুযজ্ঞ। বেদবিদ্যালয়ের পণ্ডিতমণ্ডলী যেমন যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী আছেন তেমনি মধ্যমণি হয়ে যজমানের আসনে উপবিষ্ট আছেন সস্ত্রীক ডঃ দেবীদাস নন্দ যিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বিশিষ্ট অধ্যাপক। সংকীর্তন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন বিরক্ত সংঘ বিদ্বৎসংঘ, যুবকসংঘ, সতীসংঘ এবং ওঙ্কারনাথ মিশনের সভ্য সভ্যাবৃন্দ। পরিচালনায় থাকেন সমগ্র ভারতব্যপী অদ্বিতীয় হরিনাম প্রচারক এবং মাননীয় ট্রাস্টী (A.B.J.S.) কিংকর বিরাগানন্দজী মহারাজ।

সভামঞ্চে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পর্য্যায়ক্রমে চলতে থাকে। সভা পরিচালনা করেন প্রধানত ওঙ্কারনাথ

মিশনের সর্বভারতীয় মহাসচিব শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদজী। তাঁর অনবদ্য সুকণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের রচনা থেকে পাঠ করে শোনান একদা বিখ্যাত দূরদর্শন-শিল্পী শ্রী অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য। শ্রীশ্রীঠাকুরকথায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট সীতারাম সেবকবৃন্দ যথা---কিঙ্কর বিরাগানন্দজী, সহ-সর্বাধীশ ও ওঙ্কারনাথ মিশনের সর্বজনমান্য আচার্য্য ডঃ লোকনাথ চক্রবর্তী। শ্রীগুরুনিত্য সেবক কিঙ্কর শরণানন্দজী, ওঙ্কারনাথ মিশনের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি কিঙ্কর সমীরণভাই, বিশিষ্ট সীতারাম গবেষক ডঃ সুখেন্দুভাই (কিঙ্কর সেবারাম দুর্গানন্দ), বিশিষ্ট সীতারামসেবক সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, উদীয়মান প্রতিভা কিঙ্কর ডাঃ অর্ক ঘোষ। এই বৎসরের সভামঞ্চের সেরা অনুষ্ঠান একইসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকটি নতুন প্রকাশঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাজীবনী ও বাণী সীতারাম-মহাসিন্ধু তীরের (২য় ভাগ) আবরণ উন্মোচন করেন সংঘ সহ-সর্বাধীশ কিঙ্কর সামানন্দজী। শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজী জীবনীগ্রন্থ আচার্য্য ভূমানন্দদেব রচিত OUR MASTER মহাগ্রন্থটি প্রায় অর্ধশতাব্দী পর ওঙ্কারনাথ মিশনের পক্ষে পুনঃপ্রকাশ করেন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজজী মহারাজ। সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ কর্তৃক প্রকাশিত, সংঘের যুগ্ম মহাসচিব কিঙ্কর জয় (শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরী) কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবর্তিত বিভিন্ন মঠ আশ্রম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদির সংক্ষিপ্ত একান্ত প্রয়োজনীয় ইতিহাস ওঙ্কার দর্পণ প্রকাশ করেন ডঃ লোকনাথ চক্রবর্তী। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সংঘের আদিকালের অন্যতম কর্ণধার বর্তমান সর্বাধীশজীর পূজ্য পিতৃদেব আচার্য্য বিমলকৃষ্ণ রচিত এবং পণ্ডিত বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় ও সহশিল্পীবৃন্দ কর্তৃক VCD তে রূপায়িত সীতারামায়ণের আবরণ উন্মোচন করেন কিঙ্কর সমীরণভাই। একই মঞ্চে পথের আলো পত্রিকার ওঙ্কারপঞ্চমী বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশলাভ করে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সমাচার এই যে সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজজীর উদ্যোগে মহামিলন মঠের বর্তমান সহ মঠাধ্যক্ষ একান্ত উৎসাহী সীতারামসেবক শ্রীমান্ অরবিন্দভাই এবং মহামিলন মঠের সুযোগ্য কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমান্ দেবনাথজীর সার্বিক সহযোগিতায় বহুবৎসর বন্ধ শাস্ত্র ভগবান প্রেসের পুনরারম্ভ পর্ব এই পুণ্যদিনেই সংগঠিত হয়। বিপুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে সর্বাধীশজী প্রেসঘরের সদ্যস্থাপিত কম্পিউটারের বোতাম টিপে উদ্বোধন করেন।

শ্রীগুরুমন্দিরে শ্রীনাম প্রতিযোগিতা চলতে থাকে, বিচারকের ভূমিকায় কিঙ্কর অমলানন্দজী, কিঙ্কর বিরাগানন্দজী ও কিঙ্কর জনার্দনভাই। মধ্যাহ্ন প্রসাদ বিতরণও এবার অনেক সুষ্ঠুভাবে হতে থাকে। মূল ভোগঘরের বিভিন্ন মন্দিরের প্রসাদের আয়োজন এবং কিছু প্রাচীন তথা নিয়মনিষ্ঠ ভক্তদের প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা। বিশাল নাটমণ্ডপের প্রশস্ত তলঘরে সহস্র সহস্র ভক্তের উত্তম প্রসাদের ব্যবস্থা। সীতারাম ভবনের ছাদে সদ্য দীক্ষার্থী ও তাদের আত্মীয় পরিজন তথা বহু অতিথি অভ্যাগতের সুব্যবস্থা। শ্রীগুরুমন্দিরের পাশেও শ্রীশ্রীঠাকুরের তথা তাঁর কিছু বিশিষ্ট ভক্তের একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। চারটি জায়গায় আলাদাভাবে ভোগরন্ধন তথা প্রসাদবণ্টনের প্রচুর ব্যবস্থা থাকায় ভক্তগণের উত্তাল ভিড় এক জায়গায় দানা বাঁধতে পারে নি। তাই সুষ্ঠুভাবে সুশৃঙ্খলভাবে প্রসাদ বিতরণ সম্ভব হয়েছে। সুশৃঙ্খলভাবে প্রসাদ বিতরণ এইবার সম্ভব হয়েছে আরও একটি কারণে—উপযুক্ত পরিবেশনকারীর দল ছিল বলে মূল ভক্তশ্রোতাকে সামাল দিয়েছে নাটমণ্ডপের তলায় যুবক সংঘ, ওঙ্কারনাথ মিশনের সুশিক্ষিত বাহিনী। সীতারাম ভবনকে সুরক্ষা করেছে প্রধানত শ্যামবাটীর (আরামবাগ) নব নিযুক্ত বাহিনী। মূল ভোগঘরে মঠাধ্যক্ষ রবীনদার তত্ত্বাবধানে পুরাতন বাহিনী তো বরাবরের মত এবারেও যথেষ্ট সেবা করেছে।

বাকি অনুষ্ঠানের মধ্যে উত্তর হাওড়া নাট্যাঙ্গন ইন্দ্রজিৎ ঘোষের পরিচালনায় 'নদীয়ানাগর' শ্রুতিনাটকের অভিনয় নতুনত্ব নিয়ে এসেছে। বৈকালিক ধর্মসভা সর্বাধীশজীর সভাপতিত্বে তথা সহ সর্বাধীশ কিঙ্কর সামানন্দজীর পরিচালনায়, প্রধান অতিথি বিশিষ্ট মহাত্মা বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারীজী, বিশিষ্ট অধ্যাপকদ্বয় তারকনাথ অধিকারী ও তিলক ভট্টাচার্য্যের যোগদানে সুচারুরূপে

সম্পন্ন হয়। প্রধান বক্তা হিসাবে দার্শনিক লোকনাথজী সীতারামদর্শন বিষয়ে তাঁর গভীর মনন তা বিচিত্র বিশ্লেষণের উপযুক্ত সাক্ষর রাখেন।

সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে ওঙ্কারনাথ মিশন স্কুল অফ্ মিউজিকের পরিচালক পণ্ডিত বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় এবং সহশিল্পীবৃন্দের 'শ্রীগুরুমহিমা' নামাঙ্কিত গীতিঅর্ঘ্য নিবেদন নতুনত্ব দাবী করে। অপরদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত তথা মহামিলনের মিলনমেলায় সুপরিচিত স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় অপূর্ব সংগীত পরিবেশনে নিজ আভিজাত্য বজায় রাখেন যা বলাই বাহুল্য।

মহোৎসবের দ্বিতীয় দিনটি প্রধানতঃ নির্দিষ্ট ছিল মাতৃমণ্ডলী সতীসংঘের জন্যই। শ্রীশ্রীঠাকুরকথায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া কিঙ্করী যোগেশ্বরী মা অর্থাৎ শিবানীমা, কিঙ্করী জজমা অর্থাৎ রেবামা, নবীনাদের মধ্যে কিঙ্করী বনশ্রী এবং কিঙ্করী সোমা যশোয়াল। একই মঞ্চে কীর্তন পরিবেশনের নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন বিশিষ্টা কীর্তনীয়া শ্রীমতী রূপা ঘোষ। তবে সতীসংঘের মাতৃমণ্ডলীর মধ্যে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি হয় সতীসংঘের জন্য নির্দিষ্ট দিনে সতীসংঘের নিয়মিত সেবিকারা নিজ নিজ বক্তব্য রাখবার তেমন সুযোগ পান নি বলে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। এই ক্ষোভ সংগত। তাই আমরা অনুষ্ঠান পরিচালন কমিটির কাছে বিশেষ অনুরোধ রাখব ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠানে এই জাতীয় ভুল যাতে সংশোধিত হয়।

দ্বিপ্রহরকালীন ভক্তিগীতিতে অংশগ্রহণ করেন বেশ কয়েকজন প্রবীণা ও নবীনা কণ্ঠশিল্পী—শ্রীমতী বুলু লাহা, শ্রীমতী তনুশ্রী দে, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী অর্পিতা হাজরা, কুমারী অরুন্ধতী সাহা। সান্ধ্যকালীন তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীমতী দেবাঙ্গনা দাসের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন নিঃসন্দেহে বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান—অলস্টার নাট্য সংস্থা নিবেদিত শ্রী গোপাল মজুমদার পরিচালিত কৃষ্ণসুদামা নাট্যানুষ্ঠান।

শ্রীভগবান শ্যামসুন্দরের মন্দির প্রাঙ্গনে তাঁরই অনুপম লীলা বিষয়ক এই কৃষ্ণসুদামা নাট্যানুষ্ঠান। সমবেত ভক্তগণের নিঃসন্দেহে চিত্তহরণ করে। তাই দেখা যায় সর্বশেষ অনুষ্ঠান সমাপ্তিতে কিছুটা রাত্রি ঘনিয়ে এলেও নাটমণ্ডপ ছিল শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ে ঠাসা।

মহোৎসবের তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী বিশেষ পূজাদির কথা তো আছেই যার উল্লেখবাহুল্য। কিন্তু যা উল্লেখযোগ্য তা হল তরুণ প্রতিভা বৈভব সরকার কর্তৃক সুমধুর স্বরে অভয়বাণী পাঠ। দ্বিতীয়তঃ সুমধুর সুরে দরাজকণ্ঠে উদীয়মান শিল্পী শ্রীমান্ সুস্মিত নন্দের ভজন পরিবেশন। পরবর্তী অনুষ্ঠান ওঙ্কারনাথ মিশনের বিশেষ সভা—পরিচালনায় মিশনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি সুবক্তা সমীরণভাই এবং সর্বভারতীয় মহাসচিব সুসংগঠক দেবীপ্রসাদজী এবং বাংলার কার্য্যকরী সভাপতি শ্রীনামনায়ক নয়নভাই। ভক্তিগীতি নিবেদনে নৈহাটির সুগায়িকা বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় ও যুবক সংঘের সুগায়ক সুনীল বিশ্বাস।

যুবক সংঘের পরিচালনায় বিশেষতঃ সংঘ সভাপতি সুযোগ্য সীতারাম সেবক অনুপ দাস এবং নবনির্বাচিত সেক্রেটারী ধ্রুবভাই, ব্যবস্থাপনায় ছোটদের 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা ও 'যেমন পারো সাজো' (Go As you Like) অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয়। মহামিলন মঠের চারিপার্শ্বস্থ পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন আগ্রহী অভিভাবকদের হাত ধরে অতি উৎসাহ ভরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আসছে—তা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি মহোৎসবের আনন্দ উচ্ছাস শুধু প্রাচীন ও যুবক ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এই পরমানন্দময় মহাযজ্ঞে ছোটবড় সবারই সাদর নিমন্ত্রণ। যুবক সংঘ পরিচালিত এবারের 'যেমন পারো সাজো' অনুষ্ঠানটি উৎসবানন্দে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যখন মহামিলন মঠের উদার মাঠে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে নানা সাজে কিশোর-কিশোরী ও বালক-বালিকারা —সেটি সত্যিই ছিল এক অভিনব অনবদ্য দৃশ্য। মাদার টেরেসার সাজে ছেলেটিকে নিথরভাবে এক ভক্তের মাথায় হাত দিয়ে প্রসন্ন মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হবারই কথা—এমন নতুন সাজে যে স্থির চিত্রার্পিতের মত

দাঁড়িয়ে আছে সে মানুষ না পাথর। ছেলে না মেয়ে? অপরদিকে বালক শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে যে শিশু ক্রন্দন পরায়ণ হয়ে বারবার চোখ মুছছে অথবা পলায়ন পরায়ণ হচ্ছে, না বুঝেই বুঝি সে আসল শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাই যথাযথ পালন করছে। ক্যামেরা ও নোটবুক হাতে Reporter বালকটিও বেশ স্মার্ট ও অভিনয় নিপুণ। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল— কলকাতা চৌধুরী বাড়ীর কন্যাদ্বয়া কল্যানীয়া ইন্দ্রাণী ও চন্দ্রাণী দুই ভগ্নী। এই ভগ্নীদ্বয়া অনবদ্য রাধাকৃষ্ণ সেজেছিল। বাঁশী হাতে বংশীবয়ান যখন মধুর হাসিতে বামে সুন্দরী রাধাকে নিয়ে মহামিলনের নাটমন্দিরের সম্মুখভাগে অতুলনীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল—তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল—মন্দির ছেড়ে শ্যামসুন্দর শ্যামরাণীও কি প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য স্বয়ং মাঠে নেমে পড়লেন।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ওদিকে ভক্তগণও যাতে গৃহমুখী না হয়ে মঠমুখীই থাকেন সেই উদ্দেশ্যেই বুঝি যুবক সরোদ বাদক শ্রীজয়দীপ মুখোপাধ্যায় তাঁর বিরল যন্ত্রে মধুরাতিমধুর তান তুলতে লাগলেন। না আর ঘরে ফেরা হল না—

মন্দ মন্দ মধুর তান সখী কোন বা কুঞ্জে বাজিল রে।
বাঁশী না জানে অন্য পর কি আপন তবু মন সব দহিল রে॥

দিনের তথা তিনদিনেরই সর্বশেষ তথা সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান—সিল্যুয়েট ড্রীমস্ নিবেদিত অতুলনীয় নাট্য প্রতিভা শ্রীমান্ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত, শ্রীভগবান ওঙ্কারনাথদেব রচিত দুগো খ্যাপার নয়নমনহরণকারী গল্প অবলম্বনে সার্থক নাট্যরূপ 'পরমেশ্বরী'। এত অল্প খরচে এত জাঁকজমক বিহীন সাধারণ সাজগোজে, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর প্রাণবন্ত নাটক —নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের দাবী রাখে। সুপরিচালক নারায়ণজী শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারার নাট্যরূপদানে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে যা হল 'আমজনতার যুগ'। অল্প ব্যয়ে অল্প আয়াসে বাংলার যত্রতত্র গ্রামেগঞ্জে নারায়ণজী পরিচালিত নাটকগুলি সহজেই মঞ্চস্থ করা যায়। না শুধু বাংলাতেই নয়, জগন্নাথক্ষেত্রেও নারায়ণভাইকে আবার ডাক দিয়েছে 'যা যা নাম দিগে যা' মহোৎসব ১০ই বৈশাখ। 'সীতারামস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।' হে মহাপ্রভু সীতারাম! তুমি নব নব রূপে বারবার আমাদের দর্শনদানে ধন্য কর। তোমার নিত্যনতুন লীলাচিন্তায় আমাদের মগ্ন করো। লঘুপায়ে এই ঘোর সংসার সাগর হতে, হে সমর্থ কাণ্ডারী, আমাদের অবলীলায় পার করে দাও!

'মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ!' মধুরাতিমধুর সীতারামের বর্তমান লীলা বিস্তারেরও কি ইতি করা যায়? কবে জন্মতিথি মহোৎসব সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে—আবার আহ্বান! এইবার আবার একেবারে নতুন ক্ষেত্র, নতুন প্রদেশ, নতুন পরিবেশ। ৮ই ও ৯ই মার্চ প্রভুর জন্মতিথি মহোৎসব পালনের জন্য আহ্বান এল ঝাড়খণ্ডের শিল্পনগরী টাটা জামশেদপুর থেকে। প্রধান উদ্যোক্তাদ্বয়—যুগসালাই Hotel Meridian এর মালিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ব্যানাজী এবং তাঁরই বন্ধুস্থানীয় বড়জোড়ার ভক্তশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জন বাজপেয়ী। বিষ্টুপুর 'মিলনী' সভাকক্ষে যথেষ্ট আড়ম্বরের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব প্রতিপালিত হয় ৮ই মার্চ, নামগান প্রবচন ও অকাতর প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে। কোন এক বিবাহ উপলক্ষ্যে এসে অকল্পিতভাবে সভায় যোগদান করেন ভুবনেশ্বর আশ্রমের কর্ণধার ধর্মপ্রাণ দম্পতি শঙ্করদা ও শিখাদি, দিল্লী হতে প্রীতি পানোয়ার, আশীষভাই ও সুমিতা ঠাকুর। পরদিন ব্যানার্জী বাড়ীতেও পূজানুষ্ঠান হয়। নামকীর্তনাদি হয় সুবিখ্যাত গৌরাঙ্গ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক অশোক ঘোষের বাড়ীতে। দেরী হলেও শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছান বহুবিশিষ্ট সীতারাম-ভক্ত ডঃ শান্তনু চক্রবর্তী। টাটার বিখ্যাত ব্যানার্জী বাড়ীর সকলেই তিনদিন পরমানন্দে বিভোর থাকে প্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে। বাড়ীর সাত বছরের ছোট্ট ফুট্‌ফুটে ছেলে আর্য্যকে যখন সর্বাধীশজী বলেন 'গুরু গুরু' জপ কর, সে ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করে—কে গুরু? সর্বাধীশজী প্রভুর চিত্রের দিকে ইঙ্গিত করলে আর্য্য ভক্তিভরে প্রণাম করে জানায়—ওকে তো আগে দেখিনি। কোন গুরুকেই দেখিনি। তোমরাই প্রথম গুরুজীকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এলে! জয়গুরু।

পাঠকের পত্র

['পথের আলো'র পাঠকদের মতামত আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করি, এবং প্রয়োজন মত সম্পাদকীয় বক্তব্যও জানানো হয়। এই পত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা পাঠককুলের কাছে সেটি আমাদের মতামত সহ নিবেদিত হল। এর মাধ্যমে শ্রীভগবান্ ওঙ্কারনাথদেবের আদর্শে সনাতন ধর্মের প্রতি অনন্য নিষ্ঠার যেমন স্পর্শ আছে, তেমনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সবই যে শ্রীহরির শরীর এই ব্রাহ্মী অনুভবে স্থিত বুদ্ধির যে উদারতা তারও মণিকাঞ্চন সংযোগ পরিলক্ষিত হবে। তাই এই পত্র প্রকাশ। -সম্পাদক]

পথের আলো, মাঘ-১৪২০, ওঙ্কারপঞ্চমী সংখ্যার পৃঃ ৪২৮ থেকে ৪৩৪-এ যে সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত ও মর্মাহত হইয়াছি। তাই এই পত্র। আমি 'পথের আলো'-র গ্রাহক নহি, তবে নিয়মিত পাঠক। আমি সংস্কৃতভাষা প্রচার ও প্রসার কার্যে ব্রতী আছি। বৃত্তি আমার অন্য।

কয়েকদিন পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যাটি পড়িয়া এত দুঃখ পাই যে বিশ্বহিন্দু পরিষদের সভাপতিকে তৎক্ষণাৎ ফোন করি। শুনিলাম তিনি বহির্বঙ্গে গিয়াছেন, পক্ষকাল পরে ফিরিবেন।

যাঁহারা ইসলামী শয়তানীর সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন Love-Jihaad এর কৌশল। সুদর্শন ও সুপ্রতিষ্ঠিত সপ্রতিভ মুসলমান যুবকরা—উৎপল চঞ্চল বাদল বংশী রাজা প্রভৃতি—হিন্দুসুলভ নামে পরিচিত হইয়া আধুনিকা হিন্দুযুবতীদের প্রেম নিবেদনে করিয়া বিবাহ করিতেছে। মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধি করার এই কৌশলই Love-Jihaad।

অনুরূপ কৌশল Peace-Jihaad। শান্তির বাণী বিতরণ করিয়া গোবেচারা অসতর্ক ক্লীব হিন্দুদের সর্বনাশ সাধনই তাহার লক্ষ্য। আপনারাও তাহার নিশানা হইলেন এই আমার আশঙ্কা। তাহা না হইলে কোন্ কৃতিত্বের জন্য কিংবা কোন্ সদর্থক শান্তির বাণী বিতরণ করিবার জন্য 'Prophet of World Peace' দেওয়া হইল এক মুসলমানকে? এবং তাহাও একজন ইমামকে?

সর্বপ্রথমে জানাই মুসলমানকে সম্মান দেওয়ায় আমার আপত্তি নাই, কিন্তু প্রশ্ন কেন সেই সম্মান? কোন্ অবদানের জন্য?

রামেশ্বর ধামে একটি পবিত্র সরোবরে কোনও এক পুণ্যতিথিতে দেব-দেবীর সচল মূর্তিদের নৌকাবিলাস আয়োজিত হয় প্রতিবৎসর যাহা দর্শন করিতে অগণিত নরনারী আসেন। একবার নৌকাবিলাস চলিবার সময়ে দমকা বাতাসে নৌকা দুলিয়া ওঠায় ঠাকুর জলে পড়িয়া যান। ক্ষণমাত্রকাল অপেক্ষা না করিয়া একজন দর্শনার্থী জলে ঝাঁপ দেন এবং ঠাকুর তুলিয়া আনেন। মানুষটি একজন স্থানীয় মুসলমান, নুলিয়া। মন্দির কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে মুখ্য মর্যাদা দিয়াছিলেন। ইঁহারই পৌত্র এ.পি.জে. আব্দুল কালাম।

*ভারতবর্ষে মুসলিম-ভাবনা এবং মুসলিম-জীবন বিষয়ে ফতোয়া দিবার জন্য যে মঞ্চগুলি বিশেষ সম্মানার্হ তাহার মধ্যে দারুল্-উল্-উলুম্-দেওবন্দ সমধিক বিখ্যাত। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ মুসলমান—এমনকি অগণিত পাকিস্তানিও—ইহার অনুগত। বছর কয়েক আগে এই মঞ্চের উলেমা ফতোয়া দিয়াছিলেন ভারতবাসী মুসলমানরা বক্র্-ঈদ্-এর সময়ে গরু নয় অন্য পশু কুরবানী করুন। কারণ তাহাতে হিন্দুদের অন্তরে ব্যাথা কম দেওয়া হইবে। এই ফতোয়ার জন্য দেওবন্দের উলেমাকে সম্মান জানানো যাইত, কারণ শান্তি স্থাপনের অনুকূলে এই ফতোয়া এক সদর্থক পদক্ষেপ ছিল।

*নবদ্বীপের বকুলতলা স্কুলের শিক্ষক সিরাজ-উল-ইসলাম একজন প্রখ্যাত ভাগবতব্যাখাতা। শ্রীমদ্ ভাগবতাদি পুরাণ এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি চৈতন্য লীলাগ্রন্থ হইতে ইনি অতি সরসভাবে কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা পরিবেশন করেন। ইঁহাকে সম্মান জানানো যাইত।

* Life Divine Society -র প্রতিষ্ঠাতা ভগবান শিবানন্দ সরস্বতীর কৃপাধন্য, পরে কাঞ্চীর শংকরাচার্য্যের অনুগত ভক্ত, অরবিন্দ-সাহিত্যে নিষ্ণাত, স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়াও মুসলমানসুলভ মৌলবাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, মার্গীয় কর্ণাটক সঙ্গীতে পারদর্শী, ভারতপ্রেমিক সন্ত এ.পি.জে. আব্দুল কালামকে সম্মান জানানো যাইত। তবে মুসলমানরা ইঁহার মুক্তিমনস্কতায় অসন্তুষ্ট, ইঁহাকে মুসলমান বলিতে চায় না।

*সারা ভারতবর্ষে অগণিত পত্রিকা সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত হয়। বারাণসী হইতে যে কয়টি প্রকাশিত হয় তাহার একটির সম্পাদক-প্রকাশক একজন মুসলমান। সংস্কৃত শিক্ষার পরিপোষণে ইঁহাকে সম্মর্ধিত করাই যাইত।

তাহা না করিয়া যাঁহাকে সম্মান দেওয়া হইয়াছে তিনি একজন ইমাম এবং কয়েক লক্ষ ইমামের সাংগঠনিক নেতা। ইমাম মাত্রকেই ঈদ্-এর নেমাজে যে কথা উচ্চারণ করিতেই হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল— (সূত্র—'হরফ', প্রকাশিত মুসলিম পঞ্জিকা, বঙ্গাব্দ ১৪০৭, পৃঃ ১৬০) ঃ

হে আল্লাহ্, ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের চিরকাল জয়যুক্ত করুন। আর অবাধ্য কাফের, বেদআতী ও মোশরেকদেরকে সর্বদা পদানত এবং পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ্! যে বান্দা আপনার আজ্ঞাবহ হবে, তাঁর রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন, তিনি রাজার পুত্র রাজা হউন, কিম্বা খাকান পুত্র খাকান হউন, হে আল্লাহ্! আপনি তাঁকে সর্বদিক দিয়া সাহায্য করুন। হে আল্লাহ্! আপনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাঁরই তরবারি দ্বারা বিদ্রোহী, মহাপাতকী, অবাধ্যদের মস্তক ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন। হে আল্লাহ্! আপনি ধ্বংস করুন, কাফেরদের, বেদায়াতী ও মোশরেকদের।

এই নেমাজ যিনি অগণিত মুসলমানকে দিয়া উচ্চারণ না করান তিনি ইমামের পদ পাইতেই পারেন না। এমন একজনকে 'Prophet of World Peace' উপাধি দেওয়া সত্যের অপলাপ কেবল নয়, আত্মবিক্রয়ও বটে।

আনন্দময়ী মা-র বিশেষ অন্তরঙ্গ—অধুনা পলিতকেশ একজনকে যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করি, তিনি বলেন গোপাল মিত্র মা-র শিষ্য নন। ছবিগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি মন্তব্য করিলেন—জয় মা-র ছবি এমনভাবে? শুনুন, কোনও মুসলমান কিংবা হীনকর্মরত হিন্দু, জয়মা-র আশ্রমে আসিলে জয়মা বালতি বালতি জল দিয়া আশ্রম প্রাঙ্গণ ধুইবার আদেশ করিতেন।

পরে ফিরহাদ হাকিমের ছবি দেখিয়া মন্তব্য করিলেন—গোপাল মিত্র নিজের ব্যক্তিগত কোনও দুরভিসন্ধির জন্য ইহা করিয়াছেন মনে হয়। রাজনীতি কিংবা ব্যবসায় বৃদ্ধি কিংবা অন্য কোনও কারণ থাকিতে পারে। উনি তাহার জন্য যাহা করিবার ছিল তাহাই করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সংস্কৃত বা সংস্কৃতির কোনও সম্পর্ক নাই, উনি এইগুলিকে নিজ-বাসনা চরিতার্থ করিতে অপব্যবহার করিয়াছেন। দুষ্ট লোকের ছলের অভাব হয় না।

যে প্রসঙ্গ আমার নিদ্রা কাড়িয়াছে সে প্রসঙ্গ ইনি ফুৎকারে উপেক্ষা করিলেন বলিয়া আমি আরও দুঃখিত হইলাম।

আমার অগ্রজোপম এক শল্য চিকিৎসক আছেন যাঁহার ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান বিস্ময়কর। তাঁহাকে মনোবেদনা জানাইলে, তিনি ভ্রূকুঞ্চন করিয়া মন্তব্য করিলেন—ওরা মুখ্যু, ওদের কোরান পড়ে দেখতে বল্। Peace? Peace of Graveyard?

পার্থপ্রতিম চক্রবর্তীর লেখা পড়িয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি ইনি বেদ হয়তো পড়িয়াছেন, কোরান পড়েন নাই। তাই আজানে ও মোয়াজ্জমে হিন্দুর আদর্শ ভাবনা সংস্কৃতি—হিন্দুর সবকিছুকেই যে ঐকান্তিক ঘৃণার সহিত উৎখাত করিবার সংকল্প করা হয়, এই নির্বোধ বৈদিক অধ্যাপক জানেন না। তিনি শব্দ শোনেন, শব্দার্থ বোঝেন না। তাই মূর্খের মতোই সব ধর্মের সমীকরণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। ইঁহার বিষয়ে বলা যায়—

অকৃত্যং মন্যতে কৃত্যং সুগমং চ সুদুর্গমম্। অভক্ষ্যং মন্যতে ভক্ষ্যং বাসনাপ্রেরিতো জনঃ।।

এই পাপকে যাঁহারা সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহারা বেদ বিক্রয়ী হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের বুদ্ধিলোপ হইলে কী অনর্থ হইতে পারে তাহা আমরা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কীর্তিতে দেখিয়াছি। ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা বাইবেল সোসাইটির বিশপ—এক ধর্মান্তরিত

ব্রাহ্মণ সন্তান—ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমরা আমাদের কাজ করিয়াই যাইব। হিন্দু ধর্মের নিন্দাই আমাদের একমাত্র কাজ।

আজ দেখিতেছি কয়েকজন বিত্তভুক্ বেদবিক্রয়ী ব্রাহ্মণসন্তান হিন্দু সংস্কৃতির অপব্যাখ্যায় ব্যস্ত। হিন্দুবিদ্বেষীকে স্তুতি করিতে নতজানু।

প্রশ্ন ঃ (১) মহামিলন মঠ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে কি এই সম্বর্ধনা দেওয়া হইয়াছিল?

(২) পূর্বে অনুমোদন না লইলেও, পরেও কি এমন কাজ অনুমোদন করেন মহামিলন মঠ কর্তৃপক্ষ? অথবা পথের আলোর সঙ্গে সম্পর্কিত জনেরা?

(৩) ইমাম উমের আহ্মেদ ইলিয়াসি কি গোহত্যা বন্ধ করিবার কথা বলেন? ইনি কি মুসলমান নারীদের মসজিদে প্রবেশের অধিকার দিতে সচেষ্ট আছেন? শিয়া-সুন্নি-বোহ্রা-সৈয়দনা-সুফী-বাহাই প্রভৃতিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ দূরীকরণে এবং গোরস্থান দখল জনিত সংঘর্ষ নিবারণে ইঁহার ভূমিকা কী? আরব দুনিয়ায়, বিশেষ করিয়া সিরিয়া-তে, বাংলাদেশে, পাকিস্তানে, মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করিতেছে নিরন্তর। এই সকল স্থানে শান্তিস্থাপনে ইমাম ইলিয়াসীর কী ভূমিকা ছিল? বা আছে?

(৪) মারিয়া ফার্ণাণ্ডেজকে চিনি না। তবে ফিরহাদ হাকিম একজন খ্যাতনামা গুণ্ডা। চেতলা সাহাপুর মহাবীরতলা অঞ্চলের বাসিন্দারা সকলেই একে গুণ্ডা বলিয়াই জানেন। ইহাকে মন্ত্রীত্ব পদ দিয়া তাহার মাধ্যমে বন্দর অঞ্চলের মুসলমান অপরাধীদের বশ করিয়া অপরাধীদের অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থের ভাগ নেওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের একটি রাজনৈতিক চাল। এমন অমানুষের অনুভবের মহিমা কীর্তন করিয়া কিংকর সমীরণ পদলেহী সারমেয় স্তরে নামিয়াছেন।

(৫) সংস্কৃত ভাষার মহিমায় ইমাম ইলিয়াসী কবে আকৃষ্ট হইলেন? সম্বর্ধনা পাইবার আগে? না পরে?

(৬) বেশ কয়েকজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মুসলমান আছেন। ইঁহাদের একজন, তাবিজ দিয়া বহুজনের বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ করিয়াছেন। প্রতিবৎসর কলকাতায় তাঁহার সপ্তাহ শিবির বসে। ইঁহাকে কি সাধক বা গডম্যান বলা যায়?

(৭) কেউ যদি গোপাল মিত্র বা কিংকর সামানন্দকে বা যে কোনও ব্যক্তিকে ভালোবাসিয়া ফেলেন তাঁহাকে বৈদিক বিদ্যালয়গুলি Prophet of World Peace উপাধি কেন দিবে? বেদের সহিত এই ভালোবাসার কী সম্পর্ক?

সংস্কৃত শিখিবার সময় একটি শ্লোক শিখিয়াছিলাম। সেইটি ব্যবহার না করিয়া পারিলাম না।

বানরস্য বিবাহে তু গর্দভাঃ মন্ত্রপাঠকাঃ। পরস্পরং প্রশংস্যন্তি অহো রূপো অহো ধ্বনিঃ।।

আমি কর্মব্যপদেশে উত্তরবঙ্গে আছি সেজন্য ইমেল মারফৎ পত্র পরে দিব। অগ্রিম পত্র সাধারণ ডাকযোগে পাঠাইলাম। ইতি-

মর্মাহত
সঞ্জিত ভূঞ্যা
যাদবপুর

সম্পাদকের উত্তর

পথের আলো, মাঘ ১৪২০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ওঙ্কারিত ইসলাম ঃ একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' এবং 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'—এই প্রবন্ধ দু'টির প্রেক্ষিতে শ্রী সুজিত ভুইঞ্যা প্রেরিত পত্রে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর যা আমাদের জানা আছে তা এইরকম—

১. শ্রীভগবান ওঙ্কারনাথদেব তখন ডুমুরদহে শ্রীরামাশ্রমে তপস্যালীলারত। একের পর এক মহাগ্রন্থ আবির্ভূত হচ্ছেন। এই সময়ের অনেক আগে থেকেই পরিপার্শ্বের সকলেই তাঁকে চিহ্নিত করতেন 'দেবতা' অভিধায়। এই সম্বোধনে আন্তরিক ছিলেন হিন্দু মুসলমান সবাই। সেই সমাজের দলিল চাচার প্রার্থনা ছিল 'কর্ণার্জুন' নাটক লিখে দাও। আমরা অভিনয় করব। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মৌলিক মূল্যবোধ উপ্ত করে মুসলমান সমাজের জন্য রচনা করলেন 'তাপস হবিব'। এই নাটক পরে ভক্তদের মধ্যে পাঠ করেছেন, অভিনয় করিয়েছেন এবং শিববিবাহ, অশ্রুবাদল, রণছোড়, গুরুপূজা, নদীয়া নাগর অভিনয় দেখে যেমন ভাবস্থ হতেন, সমাধিস্থ হতেন 'তাপস হবিবে'র ক্ষেত্রে যে তার ব্যত্যয় ঘটত এমন কখনও নয়। তাঁর কাছে বহু মুসলমান ভক্তের আনাগোনা ছিল, এর মধ্যে তাঁর কৃপাও পেয়েছিলেন কেউ কেউ। মৌলানা মানী, মুজিবর রহমান, তাঁর ভাগ্নে এবং সুফীগুরু বিশ্ববরেণ্য বিলায়েৎ এনায়েৎ খাঁ প্রমুখ বিশিষ্টজনও ঠাকুরের কাছে এসেছেন নানা প্রয়োজনে, আনন্দের আকর্ষণে। পুরাণে সেদিনের কিছু খণ্ডচিত্র ধরা আছে 'নব নব রূপে এসো' এবং 'সীতারাম-মহাসিন্ধু তীরে' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে। সুতরাং আমাদের প্রত্যয় হয় যে, শ্রীসীতারাম দুষ্টের বিনাশ ও শিষ্টের পালনের প্রেক্ষিতে কখনও কোন সম্প্রদায় বৈষম্যকে অঙ্গীকার করেন নি। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ও ঐ ধারাই অনুসরণ করে। আমরা সব সম্প্রদায়কে সম্মান করি, তবে অন্যায় কর্ম কখনও সমর্থন করি না। বিরোধিতাও করি।

৬ অক্টোবর, ২০১৩ মধুসূদন মঞ্চে অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন প্রধানতঃ মর্ডান একাডেমী, শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ্, শ্রীসীতারাম বৈদিক আদর্শ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় এবং শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ ট্রাস্ট। এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন সমিতি ভিন্ন ভিন্ন, তাই মহামিলন মঠ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের এখানে কোন দায়িত্ব বা ভূমিকা ছিল না।

২. যে প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ অনুষ্ঠানের আয়োজক তাদের অন্যতম কর্ণধার হলেন বিশিষ্ট স্থপতি অধ্যাপক ড. গোপাল মিত্র। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপাধন্য ও অনন্য সেবক। তিনি অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের বর্তমান মহাসচিব। তাই তিনিও মহামিলন মঠের বিশিষ্ট কর্তৃপক্ষের অন্যতম। 'পথের আলো' যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা প্রচারে অঙ্গীকারবদ্ধ তেমনি সেখানেই আমাদের 'সঙ্ঘ সমাচার' নিবেদিত হয়। নিবেদিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবানুরাগীদের আয়োজিত কিছু অনুষ্ঠানের বর্ণনাও। এই সূত্রেই ৬ অক্টোবর আয়োজিত সভার বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছে।

৩. শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম সুযোগ্য শিষ্য ও অনন্য সেবক, ভক্ত শ্রীগোপাল মিত্র প্রভুর ঐ ভাবপ্রবাহের প্রেরণায় ৬ অক্টোবর, ২০১৩ মধুসূদন মঞ্চে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বলে আমাদের প্রত্যয়। সারা জীবনে যশ, খ্যাতি, অর্থ প্রতিষ্ঠার শীর্ষে আরোহণের পর অধ্যাপক গোপাল মিত্র তাঁর শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে নিজের সর্বস্ব অকাতরে আনন্দিত চিত্তে সমর্পণ করেন। তাঁর সেই অকপট নিবেদনের স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন স্বয়ং সীতারাম। তাই আমাদের বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে, অধ্যাপক মিত্রের ঐ আয়োজনের অন্তরালে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। রাজনীতি বা ব্যবসায় বৃদ্ধি—কোন বিষয়েই কোন কৌতূহল দীর্ঘকাল তাঁর নিত্য জীবনে লক্ষ্য করা যায় না।

আমরা বরং শ্রীগোপাল মিত্রের ব্যক্তিত্ব শ্রীসীতারামে সদা অবগাহিত বলেই অনুভব করি। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর জীবনে প্রাপ্তি ও পূর্ণতার সবটুকু দিয়েছেন। ফলতঃ জাগতিক বিষয়ে তাঁর উষ্ণতার অনুসন্ধান বড়ই দৃষ্টি দোষ বলেই আমরা মনে করছি।

৪. কিঙ্কর সমীরণ তাঁর অনুষ্ঠান বর্ণনাত্মক রচনায় ফিরহাদ হাকিমের নাম উল্লেখ মাত্র করেছেন, এবং অনুষ্ঠানের পক্ষে নিজমত প্রকাশ করেছেন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ না-ই করতে পারেন, তবে সজ্জনের কাছে আরও একটু শব্দ সংযম কি আশা করা যায় না?

৫. সম্বর্ধনা প্রাপ্তির পরেই ইমাম সাহেব সংস্কৃত বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন। এই পঞ্চম প্রশ্নের বিষয়টি নিতান্ত ব্যক্তিগত, যোগ্য উত্তরদাতা ইমাম সাহেব ভিন্ন অপরে হবেন বলে মনে হয় না।

৬. কবচ, তাবিচ প্রদান ঈশ্বরের বা সাধকের কাজ নয়। তবে সকলের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান—এমন সরলার্থ গ্রহণে দ্বেষমুক্তির স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে।

৭. কিঙ্কর সামানন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় গোপাল মিত্রের আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন মাত্র। এর অতিরিক্ত তাঁর সেখানে কোন দায়িত্ব বা ভূমিকা কিছুই ছিল না। উদ্যোক্তা কর্তৃক তিনিই অভ্যর্হিত হন, কোন অভ্যর্থনা করেননি।

পত্রে উদ্ধৃত সংস্কৃত সুপরিচিত শ্লোকটি আমরা উপভোগ করলাম! পত্রদাতার রসবোধ প্রশংসার যোগ্য।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেবের দিব্য জীবনের একটি ঘটনার সামান্য অংশে দৃষ্টিপাত করব। আশা করি ঐ লীলাপ্রসঙ্গই আমাদের পরম্পরার শ্রদ্ধার পরিচয়কে নির্দেশ করবে। ঘটনাটি এইরকম—১৩৫৩ সাল, নোয়াখালি দাঙ্গার সময়। ঠাকুর তখন বর্ধমানের 'বড়া' গ্রামে নামপ্রচার করছেন, একদিন নোয়াখালির দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা উঠল, সীতারাম গান্ধীজির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা, প্রণতি জানিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য ও প্রযত্নকে সম্মান জানালেন। এমন সময় দু'জন স্থানীয় মুসলমান ভক্ত এসে উপস্থিত হলেন, সীতারাম তাদের সম্মান জানিয়ে কম্বল পেতে দিতে বললেন। মুসলমান ভক্ত দু'জন বললেন, আমরা এসেছি আপনার কাছে কিছু শোনার আশা নিয়ে। সীতারাম ওঁদের তাপস-হবিবের কথা বললেন, যা তাঁরই রচিত নাটকে বর্ণিত হয়েছে। বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। উপস্থিত বৃদ্ধ মুসলমান ভক্তটি ঐ দৃশ্য দর্শন করে কয়েকবার চোখ মুছলেন। ভক্ত দু'জন এরপর ফিরে গেলেন। সীতারাম তাদের ধর্মপ্রাণতার প্রশংসা করলেন কিন্তু যারা ধর্মের নামে হানাহানি করছে, ভাগাভাগি করছে তাদের সমর্থন করলেন না। শান্ত কণ্ঠে শুধু বললেন—নোয়াখালিতে কি চলছে! আর এখানে কি দৃশ্য। তাঁরাও মুসলমান আর এঁরাও মুসলমান।

আবার একদিন গান্ধীজির মত 'সব মানুষ সমান'—একথা তাঁকে জনৈক গান্ধীভক্ত জানানোর পরে শ্রীওঙ্কারনাথদেবই দৃপ্তকণ্ঠে বলেন—''না, সব মানুষ সমান নয়, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তোমার দেখা হলে আমার নাম করে তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করো—সব মানুষই যদি সমান হয় তাহলে নোয়াখালিতে কারা ছুরি চালাল?''

শ্রী সঞ্জিত ভুঁইঞ্যাকে অনুরোধ করব শ্রীমৎ বিঠ্ঠল রামানুজজী রচিত 'সীতারাম-মহাসিন্ধু তীরে' দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায় পড়ুন—তাহলেই আমাদের বিশ্বাস, নীতি ও কর্মপদ্ধতি বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে পথনির্দেশ, তা জানতে পারবেন। পরিশেষে পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

-সম্পাদক